আমার শিকার স্মৃতি

শ্রীবিজয়কান্ত সেন

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২৫।২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা ৪

পূর্ব্বাভাষ

১৮৯৮ সালের এক শরৎ প্রভাতে আমার পূজনীয় খুল্লতাত ৺কান্তিভূষণ সেন আমাকে বন্দুক ব্যবহারে শিক্ষা দেন। তখন আমার বয়স ১৩ বৎসর। স্কুলে পড়ি। পরে সুযোগ ও সৌভাগ্যের যোগাযোগে বহু গুরুর নিকটে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা এবং শিকারবিদ্যা লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুরু ছিলেন মানভূম জিলার ঝালদার রাজা, বন্ধুবর ৺রায়বাহাদুর উদ্ধবচন্দ্র সিংহ। অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ, শিকারের নিশ্চল ও একাগ্র আসন, আত্মবিশ্বাস (Strong Nerve) ও নির্ভীকতায় ইঁহার সমকক্ষ আমার দীর্ঘজীবনে অন্য কোনও শিকারী দেখি নাই। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে, ১৯১০ সালে, রাঁচী জিলার কোলেবিরা থানার ভমর পাহাড়ের জমিদার শ্রদ্ধেয় রণবাহাদুর সিংয়ের নিকট সাহস, অধ্যবসায় এবং সহযোগী শিকারী অরণ্যবাসীদের সঙ্গে সমপ্রাণতা, নিজে বিপদের সম্মুখীন হইয়া সহযোগীদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা—শিক্ষা পাই। ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছার বিখ্যাত শিকারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও তাঁহার সমবিখ্যাত শিকারী বন্ধু গোবরডাঙার জ্ঞানদা বাবুর নিকট ১৯১১ সালে হাজারীবাগে তাঁহাদের প্রবাস যাপন কালে বিভিন্ন রকমের শিকার কৌশল ও তদুপযুক্ত রকমারী বন্দুক এবং তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করি। গিরিডির কোয়াড় গ্রামে বড়কু মাঝির নিকট অরণ্যচারী জীব-জন্তুর পদচিহ্ন পরিচয়, তদনুসরণের রীতিনীতি, সম্বন্ধে শিকার বিজ্ঞানের এক নূতন রাজ্যে প্রবেশের প্রথম দীক্ষা লাভ করি। গয়া জেলার নবীনগর থানার বাসডিহার জমিদার শ্রীযুত কালীপ্রসাদ সিংহ হাঁকোয়া করিয়া বাঘ শিকার করার এবং মড়ির উপর বসিয়া বাঘ মারার রীতিনীতি শিক্ষা দেন। বনে জঙ্গলে শিকারের আবশ্যকীর বহু তথ্য, "কি ও কেন" তাঁর কাছেই প্রথম শিক্ষা লাভ করি। ঔরঙ্গাবাদ থানার পয়োই (Pawai) গ্রামের বৃদ্ধ শিকারী এবং জমিদার সাজীবন লাল ঘোড়ায় চড়িয়া বর্শা দিয়া শিকারে অভ্যস্ত করান। পালামৌ জেলার নেতারহাটের অধিবাসী ধাওতাল উরাঁও এবং অগুরু বিরিজিয়া বনে-জঙ্গলে শিকার উদ্দেশ্যে চলাফেরা করার কায়দা-কানুন, শিকারের ভূমি, আবাস এবং চিহ্ন, ভাষা ও শব্দ (interpretation of animal sign and sound) শিক্ষা দেন। "ঘাহিল বাঘ"কে রক্তচিহ্ন দেখিয়া কোন্ অঙ্গে গুলী লাগিয়াছে, কতদূর আহত, mortal wound কি না এবং তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া অনুসরণ

করিয়া গুলী করিয়া মারার একমাত্র শিক্ষাগুরু এই ধাওতাল ছিল। বিপদের সম্ভাবনায় কেবল এক টাঙী হাতে লইয়া আমার সহচর ও রক্ষক, এই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সাহসী আদিবাসী প্রকৃত বন্ধু, ধাওতাল উরাঁও অন্ততঃ ১৫।১৬টি ঘটনায় সঙ্গ দিয়াছে। ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আহত বাঘের তাড়া সহ্য করিয়া স্থির বিশ্বাস রাখিয়া—যখন অপর সকল শিকারীগণ দৌড়াইয়া পলাইয়াছে অথবা গাছে আরোহণ করিয়াছে,—বাঘ মারিবার পর দেখিয়াছি ধাওতাল এক পা-ও আমার পাশ ছাড়িয়া যায় নাই। এই প্রকারে বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত অথচ প্রকৃত শিকারী, অরণ্যবাসী, আসিবাসী, ব্যাধ, লুব্ধক (trapper), অনেক স্তরের গুরু লাভ হইয়াছে। আজ জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহাদের কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লেখ না করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না।

(১) চোয়া ভুঁইয়া, হাজারীবাগ। চাহা শিকারে কায়দা।

(২) টুমু ভোগ্‌তা, বারাদরী থানা, রাংকা পালামৌ—হরিণ, শাম্বর, tracking এবং কালাভিতির শিকার।

(৩) শিউধারী ভুঁইয়া, কেড়, পালামৌ।—বাঘ ভাল্লুক বাইসন tracking ও তাহাদের স্বাভাবিক ভাগান, মানে পালাবার রাস্তা নির্দ্দেশ।

(৪) গোবর মাঝি (খরোয়ার) গারু, পালামৌ। বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, বাইসন, ময়ূর মুরগী এবং তাহাদের স্বাভাবিক চলাফেরার পথ।

(৫) চৈত্ত্‌ ভোগ্‌তা, লাত ও সেরেন্দাগ পালামৌ। ঐ

(৬) ইয়াকুব খাঁ, জমিদার, হেদ্‌লোগ্‌ হাজারীবাগ। বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, ময়ূর, মুরগী শিকার।

(৭) মনবহাল খেরোয়ার—বাঘ ইত্যাদির tracking ও শিকার।

(৮) সুকরা উরাঁও, কুরুমগড়, রাঁচী—বাঘ ইত্যাদির শিকার।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সরকারী চাকরী জীবনের মধ্যে প্রায় ২৭ বৎসর ছোটনাগপুরের পাহাড় জঙ্গলে Survey Settlement, Special Land Acquisition for Railways and Collieries etc. Khasmahal, Wards and Encumber Estates, Forest Settlement and Reservation এবং General Department-এর কাজে অতিবাহিত করিয়াছি। এ অঞ্চলের রাঁচী, হাজারীবাগ, গিরিডি, মানভূম, ধানবাদ, পালামৌ এবং তৎসংলগ্ন গয়া জেলার এমন কম জঙ্গল পাহাড় ও গ্রাম অঞ্চল আছে যেখানে যাতায়াত এবং শিকার করার সুযোগ গ্রহণ করি নাই। এই সব জঙ্গলের অধিবাসীরা অল্পবিস্তর সবাই jungle craft এবং অরণ্যচারী জীবজন্তুর চাল-চলন, "রাহান-সাহান" (রাহান—বিশ্রাম বা রাত্রিবাসের স্থান, সাহান—ক্রীড়াভূমি এবং চরাগাহ্‌, চরবার

জায়গা) সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। যে এলাকায় যাহারা বাস করে তাহারা সেই এলাকার জন্তু-জানোয়ারের চাল-চলন বিষয়ে অভিজ্ঞ। ভিন্ন ভিন্ন এলাকার অরণ্যচারী জীব-জন্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভেদে জীবনযাত্রার খাদ্য এবং তৎসংগ্রহের উপায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। প্রত্যেক এলাকার বিশিষ্ট অভিজ্ঞ শিকারীদের তীর্থগুরু করিয়া অনেকের শিষ্যত্ব ও অনুগ্রহ গ্রহণ করিয়াছি। শিকারের "কি ও কেন" আমার শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক মনের দ্বারা বিশ্লেষণ এবং আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি ; বিশেষ করিয়া বাঘ ভাল্লুক এবং বাইসন জাতীয় জীব-জন্তুর।

আমার বরাবর বিশ্বাস যে বইয়ে লিখিয়া শিকার শিক্ষা দেওয়া যায় না। বনে জঙ্গলে কার্য্যত এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ভিন্ন জনসাধারণ, বিশেষতঃ শহর বা পল্লীবাসীর পক্ষে এ বিদ্যা প্রকৃত শিক্ষা করা সম্ভবপর নয়। এ অবস্থায় লিপিবদ্ধ হিসাবে একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞাপন দেওয়া ও অলস অবসরের মনোরম সময় কাটানোর সুবিধা ভিন্ন অন্য কোন সার্থকতা নাই। এই কারণে খ্যাতনামা অনেক শিকারী উপরওয়ালা, রাজ্যপাল* I.C.S., I.P.S., I.E.S., I.F.S. বন্ধু ও সহকর্ম্মীর বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আমার শিকার শিক্ষা, বিশেষতঃ art of tracking and reading game-sign and pug-mark সম্বন্ধে কখনও কোন লেখা প্রকাশ করি নাই।

"গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা না মিলে এক" এই প্রচলিত প্রবাদের সত্যতা অতি দুঃখের সহিত উপলব্ধি করিয়াছি। দীর্ঘ জীবনে শিকারের আর্টের সেবা করিয়া যাহা কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলাম এবং তাহাকে যে অভ্রান্ত scientific finish-এ দাঁড় করাইয়াছিলাম সে বিদ্যা দান করিবার উপযুক্ত পাত্র পাই নাই। দুঃখ হয়, এ সঞ্চয় আমারই সহিত শেষ হইবে। পরিশ্রম ও অবসর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সুতীক্ষ্ণ কান ও ঘ্রাণ শক্তির প্রয়োগ, জীবজন্তুর স্বাভাবিক অভ্যাসগত চিন্তার ধারা, কার্য্য ও চলাফেরার কায়দা (quick interpretation of animal instincts and signs) এ সব শিকারীর থাকা দরকার। তারপর নিশানা, আত্মবিশ্বাস (strong nerve) নির্ভীকতা, sporting spirit ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব থাকার বিশেষ দরকার। আমার বিশ্বাস অনেক শিকারীরই এসব অল্পবিস্তর অথবা চলনসই রকম আছে। কিন্তু যে দীর্ঘ জীবন ছোটনাগপুরের বনে জঙ্গলে আমি এসব অর্জ্জন ও উপভোগ করিয়াছি একমাত্র স্বনামধন্য

---

*Sir Henry Wheeler I.C.S. Sir Hugh Stephenson I.C.S., Sir James Sifton I.C.S. বিহারের রাজ্যপাল, Sir Laurie Hammond আসামের রাজ্যপাল।

এক

"মিললেই হো ?"

"হাঁ হো, মার দেলকেই"

"কাঁহা পর ?"

"উ-উ-উ হা, জঙ্গল কিনারে কুর্থী ক্ষেতমে।"

১৯১২ সাল। চাকরির প্রারম্ভে তখন আমি গয়া সেট্ল্‌মেণ্টে শিক্ষানবীশ। সকালবেলা, আমিনের প্লেন টেব্‌লের উপর তার কাজ পরতাল করে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি। পালামৌ ও গয়ার সীমান্ত। দক্ষিণ দিগন্তে দেখা যায় পালামৌর ঘন বনে ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ এসে থেমে গেছে, তার কোল থেকে বিছিয়ে আছে গয়া জেলার সমতল ভূমি—বন্য ফুলের লতানে ঝোপে-ঝাড়ে ভরা। এ জায়গাটা প্রকৃতি ও মানব সভ্যতার যুদ্ধক্ষেত্র বলা যেতে পারে। দশ-পনেরো ঘর দরিদ্র চাষীর বসতী। তারা কঙ্করময় অনুর্বরা প্রকৃতিকে শস্যশালিনী করবার চেষ্টায় বন জঙ্গল কেটে চাষ করে, তিল, কুর্থী সুরগুজা অড়হরের যে সব শস্য অতি দরিদ্র ভূমিতে জন্মায় এবং এক বছর চাষের পর দু-তিন বছর জমি ফেলে রেখে দেয়, রিক্ত প্রকৃতিমাতা যাতে নতুন জন্মদানের জন্য প্রাণশক্তি সঞ্চার করে উঠতে পারেন। এই সুযোগে কেটে ফেলা বন্য গাছের গোড়া থেকে নতুন ডাল-পালা গজিয়ে উঠে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় আত্মরক্ষার জন্য অতীতে এই জেলায় অনেকগুলি মাটির কেল্লা গড়ে উঠেছিল। এই পাহাড় ঘেরা অঞ্চলের গ্রাম্য জমিদাররা উঁচু জায়গা দেখে মাঝখানে তৈরি

করেন তাঁদের সুউচ্চ মাটির গড়, খোলার চাল দেওয়া, তার আসে-পাশে তাঁদের আশ্রিতদের ঘর বাড়ি এবং পুরু মাটির প্রাচীর দিয়ে এ সমস্ত ঘিরে দেওয়া হয়। প্রাচীরের কিছু দূরে খুব ঘন করে লাগান হয় তাল গাছের সারি, যাতে তীর বা গোলাগুলি এই তাল শ্রেণীর ব্যূহ সহজে ভেদ করতে না পারে, অথচ তার আড়ালে আত্মরক্ষা করে এরা অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে শত্রুর উপর। কালের প্রকোপে এইসব কেল্লার অনেকগুলিই ধ্বংসপ্রায়, কোথাও কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই, রূপ নিয়েছে মাটির স্তূপে, কোথাও বা শুধু মাত্র উঁচু জমি যেখানে চাষ-আবাদ চলছে। কেবল তালের ঘন শ্রেণী আজো দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন যোদ্ধার মত অতীতের সাক্ষ্য ও স্মৃতি নিয়ে। এমনি একটি ধ্বংসস্তূপের পেছনে আমার প্লেন্ টেব্‌ল।

দাঁড়িয়ে কাজ করছি, গ্রামের অধিবাসীরা অনেকে জড় হয়েছে চারপাশে। হাকিম কে, সে কি কাজ করছে তাও দেখতে এবং নিজেদের সুখ দুঃখ জানাতে। এমন সময় একজন নবাগত আগন্তুকের সঙ্গে গ্রামবাসী একজনের কথোপকথন কানে এলো। তখনই বুঝলাম বাঘে কিছু মেরেছে যার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, কারণ এখানে মাঝে মাঝে পাহাড় বন থেকে এসে গ্রামের সীমায় যে সব গরু মোষ চরে তাদের উপর ওরা অতর্কিতে আক্রমণ করে। শিকারের নতুন নেশা তখন, নতুন উদ্যম। তাড়াতাড়ি কলম নামিয়ে আগন্তুককে প্রশ্ন করে জানলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তারই নতুন কেনা গরুকে মেরে অদূরে কুর্থী ক্ষেতে ফেলে রেখে গেছে। তখনই বেরিয়ে পড়লাম—সঙ্গে চল্‌ল গ্রামবাসীর দল। বনের কিনারায় ছাড়া ছাড়া ক্ষীণ কুর্থী গাছের মধ্যে পড়ে রয়েছে গরুটি। এক ঝট্‌কায় তার প্রাণ বের করে দিয়েছে। গরুর

কাঁধে শিঙের নিচেই দুপাশে বড় দুটি দুটি চারটি দাঁতের চিহ্ন পরিষ্কার বিদ্যমান, শুধু রক্তটুকু চেটে খেয়ে গেছে। মনে হল ভোরেই মারা। দিনের আলোতে খোলা জায়গায় আত্মগোপন শ্রেয় মনে করে বাঘ সরে গেছে। নবজাত ঝোপ-ঝাড় বাঘের আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থান নয়। বিস্তীর্ণ ক্ষেতের মাঝে কাছাকাছি কোথাও বড় গাছ নেই যার উপর বসে অপেক্ষা করা চলে। দেখলাম কাছে মরা গরুটির পূর্বে এক বন্য কুলের ঝোপ। ঠিক করলাম মাটিতে বসেই বাঘ মারব এবং ঝোপটি আশ্রয় করলে পূর্বদিক দিয়ে যখন চাঁদ উঠবে তখন সামনে মড়ির উপর সোজা আলো পড়বে। সঙ্গের গ্রামবাসীদের বললাম ঝোপের বাইরের সব ডালপালা অক্ষত রেখে মাঝখানটায় চার হাত লম্বা দুহাত চওড়া কোমর সমান একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলতে, কিন্তু খুব সাবধান, কোথাও যেন কোন চিহ্নমাত্র না থাকে। কাটা ডালপালা বা খুঁড়ে তোলা মাটি দূরে নিয়ে ফেলে আসে যেন। বাঘের দৃষ্টি অতি সতর্ক, কোথাও যদি সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে তারা তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ত্যাগ করে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাদের কাজ শেষ হল। গ্রামবাসীদের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে একজন গোয়ালাকে সঙ্গী করতে হল, সেও নাকি বাঘ মেরেছে। শিকার করতে গেলে যোগাভ্যাসের মত অভ্যাস করতে হয় নিঃশব্দ অনড় হয়ে। জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত যাতে না হয়, হাঁচি-কাশি তো দূরস্থান। মশার কামড়েও কোন রকম না নড়া, কোনও অঙ্গ চালনা করতে হলে তা অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে। গতিহীন জড় বনের মৃদুতম সঞ্চালনও সূচিত করে প্রাণীর অস্তিত্ব, সামান্য ফড়িংয়ের লাফও তাকে দৃষ্টি-গোচর করে তোলে বন্য প্রাণীর দৃষ্টির সামনে। যাই হোক, মোড়া পেতে বসলাম দুজনে, পাশে তৈরি Jeffry's '333 bore cordite

Rifle। গর্তটির উপর কয়েকটি কাঠ দিয়ে তার উপর ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, যাতে সেখানে যে গর্ত আছে তা বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর না হয়। আমরা এমনভাবে বসেছি যে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে বসলে ঝোপের গোড়ার ফাঁক দিয়ে আমাদের সামনে হাত সাত-আট দূরে দেখতে পাই মৃত গরুটি পড়ে আছে, আবার মাথা নিচু করলেই অদৃশ্য হয়ে যাই।

ক্রমে সূর্য অস্ত গেল। সূর্যাস্তের ক্ষীণ আভাটুকুও বিলীন হয়ে এল। থেকে গেল নীড়াগত পাখীদের কাকলী। শুক্লা-ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে রচনা করল আলো-আঁধারির মায়া। মাঝে মাঝে শোনা যায় নিশাচর পাখীর ডাক, ডানার ঝট্পট্, কখনও বা চারিদিক কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে হুতোম প্যাঁচা "দূরগুম্"। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পাহাড়ের মাথায় মাথায় জেগে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। আমরা বসে আছি অধীর প্রতীক্ষায়, আসবে আসায় মন সজাগ।

রাত তখন এগারটা। মাথা উঁচু করেই দেখি প্রকাণ্ড বাঘ। সামনের ছুটো পা মড়িটার উপর দিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের ঝোপের দিকে চেয়ে আছে, ভাবটা যেন সত্যি ঝোপই তো, যেমন ছিল? আমিও চুপ করে চেয়ে রইলাম। তার মস্ত মাথা, চওড়া ছাতি এবং কালো মোটা ডোরা আজও স্পষ্ট ভেসে ওঠে স্মৃতির নয়নে। কিছু পরে নিঃসন্দেহ হয়ে যেই সে খাবারের জন্য মুখ নিচু করেছে, অমনি আমিও বন্দুক ধরেছি। তাই দেখে উৎসুক গোয়ালাও মাথা তুলল এবং অতর্কিতে তার ভয়ার্ত কণ্ঠে বেরিয়ে এল, 'আরে বাপ রে, কাড়া সে ভি বড়া হ্যায়।' সঙ্গে সঙ্গে একটি উল্টন দিয়ে বাঘ অদৃশ্য, তার পলায়নের চিহ্নও রহিল না এত ক্ষিপ্র তার গতি। শিকারী স্বর্গের ছুয়ারে আসতেই দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। অনু-শোচনায় রাগে ছুঃখে মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। বার বার মনে পড়তে লাগল আমার শিকারের যিনি গুরু তাঁর বারণ, যেন

কখনও বাঘ শিকারে অজানা কাউকে সঙ্গী না নিই। একে অপরের জীবনের দায়িত্ব নিতে হয়, দ্বিতীয়ত অন্য জনের অসতর্ক মুহূর্তে যদি কোন শব্দ হয়।

নিজের শিকার করা মাংস খেতে সে ফিরে আসবে না এ বিশ্বাস হল না, সে নিশ্চয়ই আবার আসবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আশা ও ধৈর্য সম্বল করে উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষায় রইলাম রাত একটা পর্যন্ত। বড় বাঘের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়, তাই তাদের রীতি-নীতি ভাল করে জানবার সুযোগ তখনও আমার হয়নি, যদিও কয়েকটি চিতা ও নেকড়ে তাদের প্রাণ হারিয়েছে আমার বন্দুকের গুলিতে।

রাত দেড়টা, জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে এসেছে। হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে দেখি একপাল বুনো শুয়োর সারা ক্ষেত ছেয়ে ফেলেছে এবং চরতে চরতে তারা ক্রমশ এগিয়ে এল। হিতোপদেশের 'যৎধ্রুবাণি পরিত্যজ্য' ইত্যাদি মনে করে সামনে সবচেয়ে যেটা বড় সেটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম এবং দৌড়ে পালাচ্ছে এমনি আরো দুটিকে। পর পর তিনটি শুয়ে পড়ল। বন্দুকের শব্দ শুনে

গ্রামবাসীরা উল্লাসের ধ্বনি করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, তারাও গ্রামে আমারই মত অপেক্ষায় ছিল। দূর থেকে জিজ্ঞাসা করল উচ্চকণ্ঠে তারা কাছে আসবে কিনা, অর্থাৎ আসা নিরাপদ কি না। সম্মতি পেয়ে কাছে এল। গোয়ালার মূর্খতা শুনে তাকে এই মারে আর কি। যাই হোক, বড় তিনটি শুয়োরের মাংস পেয়ে তাদের আনন্দ কম হল না, কিন্তু আমার মনে রইল শুধু সীমাহীন ক্ষোভ, বিফলতা ও গুরুবাক্য না শোনার গ্লানি।

দুই

একোয়া

জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজ যখন পেছন ফিরে চাই, কত কথাই মনে পড়ে। কতদিনের কত ঘটনা যা হয়তো তখন খাপছাড়া ছোট ঘটনামাত্রই ছিল, আজ তারা সুসম্বদ্ধ ছোট গল্পর রূপ নিয়ে অতীতের আঁধার থেকে স্মৃতির নয়নের সামনে এসে দাঁড়ায়। শিকারের অনেক সুযোগ জীবনে এসেছে এবং করেছিও প্রচুর। নেশার উন্মাদনায় শিকার করেছি, শিকারের জন্য শিকার, প্রাণীহত্যার জন্য নয়, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে বিবেক বার বার বলেছে, "এ অন্যায়, এ অত্যাচার, এ হত্যার অধিকার তোমার নেই, জগতে কারুর নেই।" প্রতিবারই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, না, আর নয়, কিন্তু রহস্যময় ঘন বন যখন রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি ও শিকার সম্ভাবনা নিয়ে সামনে এসেছে আবার ভুলেছি সে সঙ্কল্প। নেশা এমনিই জিনিস।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। বনেলী স্টেটের রাজা কীর্ত্যানন্দ সিংহ কুশী নদীর তীরে নেপালের বন্যাঞ্চল ঘেঁষা দুটি গ্রাম ভাগলপুর খাসমহল থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। এ গ্রাম দুটি নিয়ে, সেখানকার চাষ-আবাদ বন্ধ করে গ্রামদুটিকে তিনি বনে পরিণত করিয়েছিলেন, যাতে নেপালের বন্যাঞ্চল থেকে জন্তু জানোয়ার এই নতুন বনেও আসে এবং তিনি সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে শিকার করতে পারেন। প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৯৩৩ সালে তিনি সে বন্দোবস্ত ছেড়ে দেন। তখন সুপোলের উকিল প্রথিতনামা শ্রীঠাকুরপ্রসাদ তেওয়ারি সে গ্রাম দুটি সরকারের

কাছ থেকে বছরে চৌদ্দশ' টাকায় বন্দোবস্ত নেন, কিন্তু দুবছর পর দরখাস্ত দেন যে, তাঁর টাকাটা মাফ করে দেওয়া হোক, কারণ, "বনগাধা"র উপদ্রবে ওখানে চাষ-আবাদ অসম্ভব। এই দরখাস্ত সমর্থন করে সুপোলের এস ডি ও শ্রীনন্দকিশোর সিংহ রিপোর্ট দেন এবং সে সব আমার কাছে আসে। 'বনগাধা' দেখেই আমার ঔৎসুক্য জাগল। সুপোলের এস ডি ও'কে জিজ্ঞাসা করে লিখলাম বনগাধা কি? তিনি জবাব দিলেন "Wild asses," এতদিন এত জঙ্গলে ঘুরেছি, কই বনগাধার অস্তিত্বের চাক্ষুস প্রমাণ দূরে থাক, কখন তো শুনিও নি। শিকারী বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল। সে সময়কার লাটসাহেব, বড়লাট প্রভৃতি অনেকেরই শিকারের বন্দোবস্ত করিয়েছি ও সঙ্গে নিয়ে শিকার করেছি। বনগাধার রহস্য জানবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কেম্প সাহেবকে গিয়ে বললাম। তিনি বললেন, দুর্গম পথ, তুমি যেতে চাও যাও, গিয়ে তোমার মোটরগাড়ি ভেঙে এসো, তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে। কি ব্যাপার চাক্ষুস দেখেও আসতে পারবে উকিল ভদ্র লোকের জমির তদন্ত হিসাবে।

১৯৩৬ সালের মে মাস। গঙ্গা পার হয়ে ভি—৮ ফোর্ডে সুপোলে গিয়ে পৌঁছিলাম এবং সেখান থেকে আরো উত্তরে বীরনগর থানার উদ্দেশে রওনা হলাম। ১৯০১-১৯০৪ সালে আমার কাকা মাধিপুরাতে এস ডি ও ছিলেন। আমার কৈশোরের সেই পরিচিত অঞ্চলগুলির সেদিনকার রূপ ও আজকের রূপে কত প্রভেদ! ১৯৩৪ সালে উত্তর বিহার ভূমিকম্পের যে রুদ্রলীলা প্রত্যক্ষ করেছে তার স্বাক্ষর আজও রয়েছে বিদ্যমান তার শতধাবিদীর্ণ মাটিতে। উর্বর পলিমাটি যেখানে যেখানে বিদীর্ণ হয়েছে, সেই ক্ষতর উপর জেগে উঠেছে বালুকারাশি। সেই দুস্তর বালুকারাশি কোন মতে পার হতেই চোখে পড়ল বিস্তীর্ণ ঝাউ, কাশ ও পাটেরের (হোগলা) বনের মাঝে দ্বীপের মত জেগে রয়েছে ছোট ছোট গ্রাম। এই

বন্য এলাকায় এক সময় গঞ্জ, বাজার ও সমৃদ্ধিশালী বসতি ছিল, যে গঞ্জে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট ও শস্যের ক্রয় বিক্রয় চলত। বন্যাস্ফীত কুশীর ধ্বংসলীলায় সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। মাঝে মাঝে মৃত-স্রোতা ক্ষীণ জলরেখা রয়ে গেছে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে ভরা। উর্বরা ক্ষেত সব ঝাউ, কাশ ও পাটেরের বনে ছেয়ে গেছে দূর দূরান্ত পর্যন্ত। মাঝে মাঝে এক একটা ১২৫।১৫০ হাত উঁচু নারকেল গাছ রয়ে গেছে যারা সমৃদ্ধি ও সুদিনে প্রতিষ্ঠিত। পঁচিশ-ত্রিশ মাইল অতিক্রম করে বীরনগর পৌঁছলাম। দারোগাকে আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল, পৌঁছে দেখি বীরনগর থানার দরোগাজী প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায়। বীর-নগর গ্রাম ও থানা নেপাল সীমান্তে কুশীর উপকূলে। যে জমির তদন্ত করতে হবে তা কুশীর ওপারে নেপালের সংলগ্ন। নদী পার হয়েও অনেক পথ, কোন তৈরি রাস্তা নেই, যানবাহনও দুর্লভ, তাই ঠিক হল দারোগাজী ও আমি নৌকায় খেয়া পার হব এবং জমিদারের হাতী সাঁতরে নদী পার হয়ে ওপারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে এবং পরিদর্শনের স্থানে আমাদের নিয়ে যাবে।

খরস্রোতা, প্রশস্তাঙ্গী কুশীর তীরে আমরা পৌঁছলাম। নদী এখানে তিন মাইল প্রশস্ত। নদীর ওপারেই দেখা যায় তুষার-কিরীট নগাধিরাজের ধ্যানগম্ভীর রূপ। আকাশের পটভূমিকা সন্ধ্যার আভায় রক্তিমাভ। নদীতে নামতে গিয়ে অতর্কিতে হাতীর পা পিছলে গেল। সেই যে সে ভয়ে আর্তনাদ করে ফিরে দাঁড়াল, অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর জলে নামান গেল না। অগত্যা হাতীর আশা ত্যাগ করে আমরা দুজনেই খেয়া পার হলাম যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাছেই জমিদারের এক ভাণ্ডারে রাতের আশ্রয় নিলাম। বিকেলে কালবৈশাখীর ঝড় ও অল্প বৃষ্টি হয়ে গেছে। অন্ধকার হতেই এমন শীত করতে লাগল যে, তিন-চারখানি কম্বল যা দারোগাজী জোগাড় করেছিলেন তাতে শীত

মানল না, শেষে আগুন জ্বালাতে হল সেই মে মাসে। এ যেন নগাধিরাজের রাজ্যে প্রবেশ করায় তাঁর প্রথম অভ্যর্থনা।

রাত্রে কিছু দুধ জোগাড় করা গিয়েছিল। তারই অবশিষ্টাংশ খেয়ে সকালে বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে। পথ ঘন বনের ভেতর দিয়ে। খয়ের, আমন ইত্যাদির বন। গ্রামে পৌঁছন গেল। গ্রাম দুটি বেশ বড়। বেলা এগারটায় তদন্ত শেষ হল। দেখা গেল আবাদের চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু ফসল হবার কোন চিহ্ন নেই। সম্ভবত শস্য গজাবার আগেই কোন বন্যজন্তু তাদের নির্মূল করে খেয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম বনগাধা অর্থে নীলগাই। এরা এবং বনগরু শস্য নষ্ট করে। এখানে যে-সব গ্রাম ছিল, ম্যালেরিয়া এবং কুশীর বন্যার প্রকোপে সে-সব উজাড় হয়ে গেছে। যারা রক্ষা পেয়েছে, তারা ঘরবাড়ি গরু-বাছুর ছেড়ে দিয়ে আত্ম-রক্ষার জন্য পালিয়ে গেছে। যে সব গরু-বাছুর ছেড়ে গিয়েছে তারা বনে আশ্রয় নিয়েছে, তাদেরই বংশধর এই বনগরু। তারা ভীরুস্বভাব হরিণের মত হয়ে গেছে, দিনে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, রাত্রের অন্ধকারে এসে গ্রামের শস্য নষ্ট করে যায়। যা জানবার ছিল জেনে ফিরে যাওয়া মনস্থ করে বীরনগরের অভিমুখে চলতে শুরু করেছি। দেখলাম, মাঝে মাঝে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা জমিতে আবাদ হয়েছে। শুনলাম কীর্ত্যানন্দের প্রাইভেট সেক্রেটারী বাবু রঘুবর দয়ালের জমি। কাঁটাতার মাটি থেকে তিন ফুট উঁচুতে। বুঝলাম গরু বা বড় হরিণ জাতীয় কোন জন্তুর প্রবেশপথ নিরোধ করা হয়েছে, যারা মাথা নত করতে জানে না। কাঁটার উপর দিয়ে মাথা বাড়াবে, তাতে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সূর্যবংশের বীরদের মত মাথা নত করবে না।

দারোগাজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে পথ হেঁটে চলেছি। এক জায়গায় ঘন বনে ঘেরা একটু শ্যামল প্রাঙ্গণ, ইংরাজীতে যাকে বলে glade, সেখানে হঠাৎ দেখি প্রকাণ্ড এক নীলগাই

গাছের ছায়ায় শুয়ে রয়েছে। দেখে প্রথমেই মনে হল মরা, কিন্তু শকুন শেয়াল না দেখে বুঝলাম মরে নি। দারোগাজীকে বললাম, "ও হচ্ছে যূথ পরিত্যক্ত যূথপতি, যাকে বলে একোয়া"। প্রকৃতি রাজ্যের জীব যারা তাদের মধ্যে দেখা যায় একাধিপত্যের সহজাত প্রবৃত্তি। আমি একাই ভোগ করব, আর কাউকে দেব না এতটুকুও, আমিই প্রধান, এই তাদের মনোবৃত্তি। বাঘ, হরিণ শুয়োর থেকে আরম্ভ করে হনুমান, বানর, খরগোস, বেরালদের মধ্যেও দেখা যায় শাবক জন্ম দেবার পরই, মা তার সন্তানকে সযত্নে লুকিয়ে রাখে বলবান প্রচণ্ড বাপের দৃষ্টির সামনে থেকে, কারণ ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্ভাবনা মাত্রকে সমূলে বিনাশ করতে চায় পুরুষ জানোয়ার। হয়তো মা বাঘিনী তার বাচ্চাদের সঙ্গে ঘুরছে, এমন সময় এল বাঘ, তখনই বাঘিনী তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় নিজের সঙ্গে বাচ্চাদের পলায়নের সুযোগ দিয়ে। ক্রমে পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে বেড়ে ওঠে যৌবনপ্রাপ্ত কালকের দিনের শিশু-শাবক। আমরা জানি, জন্তুদের অনেক শ্রেণী আছে যারা যূথবদ্ধভাবে থাকে, যেমন হাতী, শুয়োর, হরিণ, বাইসন প্রভৃতি, তাদের মধ্যে একজন থাকে যূথপতি। প্রাপ্তযৌবন, শক্তিশালী নবাগত একদিন হয়তো দৃষ্টিগোচর হয় যূথপতির। তখনই সে তাকে আক্রমণ করে, হয়তো নবীন প্রাচীনের শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে আবার আত্মগোপন করে দলের ভীড়ে বা অন্যত্র, কিন্তু মনে জেগে থাকে তার প্রতিহিংসার আগুন। গোপনে সে শক্তি সঞ্চয় করে, খোঁজে তার উপযুক্ত অবসর। মহাকালের বিধানে যূথপতির পরাক্রমের সূর্য একদিন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে তার নিজেরও অগোচরে। আবার একদিন যূথপতির দৃষ্টিগোচর হয় নবীন, আবার তাকে আক্রমণ করে। এবার যৌবনমদগর্বিত নবীন তাকে আহ্বান করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। কত সময় দিনের পর দিন চলে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ, যূথের অন্যান্য সকলে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকে উৎসুক নয়নে নিরপেক্ষ হয়ে,

কখনও বা তারা ধীরে দূরে চলে যায়। এবারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নবীন হয় জয়ী, প্রাচীনকে পরাজিত করে তাকে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে বিজয়গর্বে সে অধিকার করে যূথপতির আসন। দলশুদ্ধ সকলে স্বীকার করে নেয় তাকে, নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করে প্রাচীনকে, যে এতদিন ছিল তাদের সর্বেসর্বা, তাদের কত দুর্দিনের রক্ষাকর্ত্তা, অধিনায়ক। পশু-জগতের এই নিয়ম—"Survival of the fittest". যূথ পরিত্যক্ত দলপতি তখন দেখে সে একা, সে একেবারেই নিঃসঙ্গ একা, যে দলকে সে এতদিন তার আপন বলে জেনে এসেছে, যেখানে তারই ছিল সব প্রতিপত্তি, সে তাদের কেউ নয়। এতদিন যাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ছিল, তাদের ছেড়ে সে যেতেও পারে না; মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমাধি বৈশ্যের মত তাদেরই আসেপাশে ঘুরে বেড়ায়, যদি কখনও বিপদের সম্ভাবনা দেখে, নিজেকে রোধ করতে না পেরে দলের কাছে ছুটে যায় বিপদের বার্ত্তা নিয়ে। নতুন যূথপতি দ্বিগুণ আক্রোশে আক্রমণ করে তাকে, আবার সে ফিরে আসে। তখন সে জগতের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। "একোয়া" বাঘ, "একোয়া" হাতী, বা শুয়োর অত্যন্ত হিংস্র হয়। মনের একান্ত গ্লানিতে সে খাওয়া ত্যাগ করে এবং ক্রমে সর্বাগ্রে নষ্ট হয় তার দৃষ্টিশক্তি। সে এক জায়গায় তখন বসে পড়ে। তার অবস্থা বুঝে শকুন শেয়াল তার আসেপাশে এসে জোটে। অবস্থাটা কতদূর দেখবার জন্য শেয়াল সন্তর্পণে কাছে আসে। টের পেয়ে একোয়া করে ওঠে গর্জন, ভয়ে দূরে পালায় শেয়াল। ভগবান অসীম দয়ালু, ক্রমে তার সব বোধশক্তি লোপ পায়, তখন জীবিত অবস্থাতেই শেয়াল-শকুনে তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, এই তার শেষ পরিণতি। এই নীলগাই হচ্ছে সেই যূথপরিত্যক্ত। এর যদি সেই শেষ অবস্থা এসে থাকে, অবশ্যই একে মারব, নয়তো অযথা ওর প্রাণ নেবার ইচ্ছা বা উৎসাহ আমার নেই। সব শুনে দারোগাজী খুব হাসলেন, বললেন, "আপনি এ সব কি বলছেন? এও কি সত্যি হয়?" বিশ্বাস

হল না তাঁর। বললাম, চলুন দেখবেন। আমরা আরো কিছু অগ্রসর হতেই নীলগাইটা উঠে দাঁড়াল এবং ছুটে বনের মধ্যে ঢুকে গেল; কিন্তু অল্প পরেই দৌড়ে পালিয়ে এল, তাঁর পিছনে তাড়া করে এল আরেকটি সতেজ নীলগাই; এবং আসেপাশে দেখা গেল আরো অনেকগুলি। আমাদের সাড়া পেয়ে তারা আবার বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল, কেবল যে একোয়া সে করুণ চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সে জানাতে চায়—"দেখো, এদেরই ভাল করতে গেলাম কিন্তু আমার ভাল ওরা চায় না, আমি আজ কেউ নই।"

দারোগাজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, নতুন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ হল বটে, এ আগে কখনও জানিনি। উপসংহারে তাঁকে বললাম যে, যে মানুষ পশুপ্রকৃতির উপর উঠতে পারেনি সেও এমনি। অনেক বাদশাহ তাই প্রাণ হারিয়েছেন পুত্রের হাতে। প্রাচীন ভারতের মনীষীরা তাই যৌবরাজ্যে অভিষেক ও বানপ্রস্থের বিধান দিয়েছেন।

তিন

শিকারী বন্ধু কালীপ্রসাদ সিংহ

পথ চলতে গেলে যেমন পথের নিশানা জানা প্রয়োজন, তেমনি কোন কিছু শিক্ষা লাভ করতে গেলে গুরুর প্রয়োজন, তা সে লেখাপড়া, সঙ্গীত, ললিতকলা, বিজ্ঞান, দর্শন যাই হোক। শিকারের ক্ষেত্রেও তাই। এ সম্বন্ধে জ্ঞানালোক দিয়ে যারা আমার পথ করেছেন সুগম, তাঁরা সকলেই আমার গুরু। মনে পড়ে বাঁশডিহার বন্ধুবর বাবু কালীপ্রসাদ সিংহকে। তিনি প্রাচীন ও অভিজ্ঞ শিকারী ছিলেন। অমায়িক, হাসিখুসি, উদার ছিল তাঁর স্বভাব, অফুরন্ত ছিল তাঁর শিকারের উৎসাহ ও উদ্যম।

গয়া জেলার আওরাঙ্গাবাদ সাবডিভিশানের দক্ষিণাংশ। পূবে দেও, পশ্চিমে নবীনগর, উত্তরে পাওয়াই ও দক্ষিণে পালামৌ জেলার সীমানা। এই এলাকার সার্ভে ও খানাপুরীর ভার পড়েছিল আমার উপর ১৯১২ সালে। আম্বা ডাকঘরের সংলগ্ন গ্রাম দাদপাতে ছিল আমার হেড্ কোয়ার্টার। গয়া পালামৌ দুই জেলার মাঝে কোথাও গ্রাম্য পায়েচলা পথ এঁকে নিয়েছে দুই জেলার সীমানা, কোথাও বা ক্ষেতের আল ভাগ করে দিয়েছে দুই জেলাকে। গ্রাম ছাড়িয়ে যেখানে পাহাড় জঙ্গল সেখানে পার্বত্য নদী-নালা টেনে দিয়েছে সীমারেখা, কোথাও কোথাও বা উঁচু পাহাড়ের দুই দিকের ঢালু গা দুই জেলার অধিকারে। পর্বতমালার সবটাই প্রায় পালামৌ সীমানায়, তবুও দু-একটি ছোট পাহাড়, ওদেশে যাকে বলে টোংরা টুংরী এবং ঘুটঘুরী, যেন মালা থেকে ছিঁড়ে ছিটকে এসে গয়ার আবাদী গ্রামে ঘেরা উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে এসে পড়েছে।

নবীনগরের দক্ষিণে দামোরা ও ডোণ্ডা ছুটি গ্রাম ঘন বনে ভরা, বসতিহীন (বে-চিরাগী)। এই গ্রাম ছুটিকে গয়া পালামৌ উভয় জেলাই দাবী করে এবং তাই নিয়ে সীমানা সংক্রান্ত বিবাদের তদন্তে গেছি।

পাহাড় ও বনে ঘেরা ডোণ্ডায় বিশালায়তন প্রস্তরময় থাড্ডা পাহাড় যেন পৌরাণিক যুগের সুর অসুর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ, তার শিখরের উপর ছু-চারটি গাছ। এই থাড্ডার পায়ের কাছে এসে লেগেছে পাহাড়ের ঢেউ, পশ্চিমে নেমে গেছে ঢালু। শিবলিঙ্গের গোড়ায় বড় বড় পাথরের চাঙ ওরই শিখর থেকে স্থানভ্রষ্ট হয়ে এসে পড়ে আছে, তার মাঝে মাঝে চিড়চিড়ির বন। ক্রমে ঢালুতে দেখা যায় মহুয়া, আম ও অন্যান্য বড় গাছ ও লতা। বসন্ত সমাগমে চিড়চিড়ি বনে লেগেছে নতুন পাতার সবুজের সমারোহ। রতেনের লতা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে গেছে ছেয়ে, তারও নতুন পাতা বেরিয়েছে— রঙ তার সাদা। মহুয়া ফুল সবে ফুটতে শুরু করেছে। থাড্ডার পূব-উত্তর প্রান্তে যেখানে অন্য পাহাড়ের ঢেউ এসে লেগেছে তারই ঠিক গোড়ায়, পাহাড়ে ঢালু গা যেখানে সমতল দেশের দিকে ছুটে নেমে গেছে সেইখানটিতে অর্ধচক্রাকার মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা। বর্ষার জলধারা পাহাড়ের গা ধুয়ে যখন নেমে আসে এই বাঁধের বন্ধনে পড়ে যায় ধরা। বহুদিন, বহু বছর আগে যখন এখানে আবাদী গ্রাম ছিল তখন জলসেচ ও ব্যবহারের জন্য এই কৃত্রিম জলাশয়টি তৈরি হয়েছিল। জনশ্রুতি, বর্গীর হাঙ্গামার সময় এ গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, জল এসে বিস্তার করে তার আধিপত্য। বাঁধের উপর গজিয়ে ওঠে চিড়চিড়ি, রতেন ইত্যাদি। তাদের শেকড় শত শত বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে বাঁধের ভিজে মাটি, তাই এতদিনের অনাদৃত অসংস্কৃত অবস্থায়ও সে বাঁধ বর্ষার প্লাবনে ধুয়ে যায়নি। বাঁধের ভেতর দিকে পাহাড় থেকে ধুয়ে আনা বালি, মাটি, শুকনো পাতায় ক্রমে ভরে আসছে, তবুও শীতের শেষ পর্যন্ত

তার অগভীর কোলে জল জমে থাকে, তারপর দেখা দেয় পাঁক, গ্রীষ্মের দিনে তাও শুকিয়ে অজস্র রেখায় ফেটে ওঠে শুষ্ক হ্রদের বক্ষ। বাঁধের বাইরের দিকের ঢালুতে বর্ষার অঙ্গুলিচিহ্ন বিদ্যমান অজস্র খোয়াইয়ে। পূর্বকালের আবাদের ক্ষীণ চিহ্ন বিদ্যমান কোথাও কোথাও।

জায়গাটা পরিদর্শন করছি, হঠাৎ দেখলাম প্রকাণ্ড বড় এক জানোয়ারের বসে-থাকা শরীরের ছাপ পাঁকের উপর। এতবড় জানোয়ার পাঁকের উপর, মোষ ছাড়া আর কি হবে। মনে করলাম নিশ্চয়ই মোষ এখানে চরতে আসে, তাই যদি হয়, তাহলে আসেপাশেই যারা মোষ চরায় তাদের কাউকে পাব মোষের পালের সঙ্গে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারব যে এখানকার খাজনা কে এবং কোন্ গ্রামের জমিদার নিয়ে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য যে, মোষ বা চরওয়াহা দূরে থাক, কোন জন-মানবের চিহ্ন পর্যন্ত পেলাম না চার পাঁচ মাইলের ভেতর। সন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে, বন্ধুবর বাঁশডিহার বাবু কালীপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে দেখা। সারাদিনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প হল সব শুনে তিনি বললেন, ওটা মোষের বসার দাগ নয়, ও বনে বাঘের ভয়ে কোন গরু-মোষ চরে না, বিশেষ করে থাড্ডার দক্ষিণে বাঘের গর্ত বা মান, গরমের দিনে সেখানে বাঘ আশ্রয় নেয়। ওটা হচ্ছে শুয়োরের চিহ্ন।

'শুয়োরের ? না না, তা হতেই পারে না, অত প্রকাণ্ড শুয়োর ?' কালীবাবু পুরনো শিকারী, শিকারের তাঁর বিশেষ সখ ও অভিজ্ঞতা ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর দুটি অনুচর ছিল, নাম দলেলওয়া ও বাসদেওয়া। তারা জাতে বহেলিয়া বা মির শিকার; শিকারই যাদের জীবিকা, অর্থাৎ ব্যাধ। তীক্ষ্ণ তাদের দৃষ্টি এবং ক্ষিপ্র লঘু গতি। তিনি তাদের মধ্যে দলেলওয়াকে ডেকে বললেন—যা এখনি ডোঙাতে, দেখে আয় কি জানোয়ার জলায় আসে, কত বড়, একা না

অনেক, কত রাত্রে আসে। সব জেনে সোজা ডিপ্‌টি সাহেবের ক্যাম্পে খবর দিয়ে আসবি।”

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে এমন সময় দলেলওয়া এসে খবর দিল যে, একটা একোয়া শুয়োর রোজ প্রথম রাত্রে আসে। তখনই ঠিক হল রাত্রে সেখানে যাব এবং খবর পেয়ে এই অনুসারে শিকারের বন্দোবস্তের ভার নিলেন কালীবাবু।

বিকেল ৪টের মধ্যে রওনা হয়ে বাঁধের কিনারায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখনও বেলা ডোবেনি। বাঁধের বাইরের দিকে পাহাড়ের ঠিক মুখোমুখি বাঁধের সমান লেভেলে মাচা বাঁধিয়েছেন কালীবাবু এবং তার উপর ফরাস পেতে রাতের মত প্রস্তুত হয়ে বসে তিনি অপেক্ষা করছেন। সামনে বাঁধের উপরের গাছপালা রচনা করেছে যবনিকা যার পেছনে আমরা আত্মগোপন করব।

কালীবাবুর পাশে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল প্রতীক্ষায়। বসন্তের ছোঁয়া লেগে জেগে উঠেছে অরণ্যপ্রকৃতি। নাম-গোত্রহীন বৃক্ষলতা সকলে পরেছে ফুলের সাজ, বন্য করমচাফুল অকাতরে ঢেলে দিয়েছে তার সুরভি বাতাসে বাতাসে। শুক্লপক্ষের চাঁদ তখনও পূব আকাশে। রাত বেশি হয়নি, বড় জোর ৮টা হবে; হঠাৎ দেখি পাহাড়ের কোলে জঙ্গল থেকে বিশালকায় এক শূয়োর সন্তর্পণে বেরিয়ে আসছে জলের দিকে। দু' এক পা এগোয় আর আমাদের দিকে একবার ডান কান ঘুরিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। কোন সন্দেহপূর্ণ শব্দের আভাস আসে নাকি কোথাও থেকে তাই শোনে, আবার দু এক পা আসে আবার অন্যদিকে কান দিয়ে শোনে বিপদ-সূচক কোন শব্দ আছে নাকি, এমনি করে ধীর মন্থর গতিতে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে। বুঝলাম শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সারাগায়ে কাদা শুকিয়ে চড়চড়ে হয়ে আছে, চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে সাদা। সারাদিন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল পাহাড় তেতে ওঠা গরম ও তৃষ্ণা সহ্য করে, রাত্রের অন্ধকারে এগিয়ে আসছে জল খেতে।

হঠাৎ কি যে তার সন্দেহ জাগল অথবা তার কোনও অন্তর প্রকৃতি তাকে মানা করল, সে জলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল এবং জল না খেয়েই ফিরে দাঁড়াল বনের দিকে ফিরে যাবে বলে আমাদের দিকে আড় হয়ে। কালীবাবু ইসারা করলেন, সে আর আসবে না কাছে, মারতে হয়তো এখনই মারুন। তুলে নিলাম আমার জেফরির কর্ডাইট রাইফেল ·৩৩৩ বোর এবং সামনের পায়ের উপরে মেরুদণ্ডের ঠিক নিচে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি যে তার

গায়ে লেগে পার হয়ে গেল তার প্রতিধ্বনি পেলাম এবং একেবারে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। কাছে গিয়ে দেখি তখনও মরেনি। দলেলওয়া বলল, 'আর গুলি নষ্ট করবেন না বাবু ওর পেছনে, ও এখনি মরবে। গুলির শব্দ শুনে লোকজন যারা অদূরে অপেক্ষা করছিল সাড়া দিল এবং কাছে এলো। মহা উল্লাসে বার জন মিলে শূয়োরের ছ মণ ওজনের বিশাল দেহ বহন করে নিয়ে গেল। তার মাথার চামড়াটা কেটে বাঁধাব বলে পাঠালাম নর্থ ওয়েস্টার্ণ ট্যানারিতে শুধু mask এর (মুখের চামড়ার) ওজন হল পঁয়ত্রিশ সের এবং দাঁত দু'টি ৯ ইঞ্চিরও কিছু বেশি। অতি পুরানো 'একোয়া' শূয়োর।

এ শিকারের কথা শুনে পিতৃতুল্য কাকামণি চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আমাকে প্রতিজ্ঞা করালেন জল খেতে এসেছে তৃষ্ণার্ত পশুকে কখনও হত্যা করব না।

চার

পাঁচ বছর কেটে গেছে। গয়ার কাজ শেষ করে তখন পালামৌ অঞ্চলে আমার কর্মস্থল। ১৯১৭-র গ্রীষ্মকাল। পালামৌ—গয়ার দোসীমানীতে সাবানে গ্রামে আমার ক্যাম্প। সবে হেড কোয়ার্টার থেকে ফিরে ঘোড়া থেকে নামছি, এমন সময় একটি লোক ছুটে এসে হাতে একখানি চিঠি দিল। বন্ধুবর কালীবাবুর চিঠি। তিনি লিখেছেন, 'বাঘে একটা বজ্রকীট মেরেছে, আমি প্রস্তুত হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। পথের নিশানা আমার এই লোক দেবে, আপনি পত্রপাঠ চলে আসুন, সন্ধ্যার পূর্বে পৌঁছন চাই।'

লোকটির কাছে সব শুনে নিয়ে ডাবল ব্যারেল এক্সপ্রেস ৫০০ সহিসের হাতে দিয়ে তাকে সোজা এগিয়ে যেতে বললাম। হাতে কিছু জরুরি কাজ ছিল, তাড়াতাড়ি সেরে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়ে তার পিঠে চললাম কালীপ্রসাদের উদ্দেশে। পথে সহিসের হাত থেকে রাইফেল নিয়ে নিলাম। অবারিত মাঠের পর মাঠ পার হয়ে চলেছি। এক জায়গায় দেখি একজন লোক দাঁড়িয়ে। সে আমাকে থামিয়ে বলল, "ওই যে দূরে লোকটাকে দেখছেন ওর কাছ দিয়ে আপনাকে যেতে হবে।" দ্বিতীয় লোকটি দেখিয়ে দিল তৃতীয় ব্যক্তি দূরে দাঁড়িয়ে, এমনি করে কালীবাবুর নির্দেশে দাঁড়ান ন-দশ জন পার হয়ে যেখানে পৌঁছলাম সেখানে সমতল জমি শেষ হয়ে পার্বত্য-ভূমির শুরু হয়েছে। একটা বড় পাথরের উপর কালীবাবু যেন সতৃষ্ণনয়নে আমার প্রতীক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, "আমি বহুদূর থেকে আপনার গতি লক্ষ্য করছি। এ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বাঘের খবর পাচ্ছি। আপনি কাছেই ক্যাম্পে আছেন খবর পেয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম বাঘের, যাতে এই সুযোগে শিকার করা চলে। এমন সময় শুনতে পেলাম কাল বড় টাইগার একটা বজ্রকীট মেরে অর্ধেকটা খেয়ে গেছে। এখানে

পার্বত্য স্রোতস্বতী এ সময় শুকিয়ে যায়। দু-চার জায়গায় মাত্র জল থাকে, সেইখানে সব জন্তু-জানোয়ার আসে জল খেতে, বাঘও সেই সুযোগে শিকার ধরে, জলও খায়। তা আমি অন্যান্য সব জল বালি চাপা দিইয়ে দিয়েছি, কেবল যে জলের কাছে বজ্রকীটটা পড়ে আছে সেখানটা ছাড়া। বাঘ আজ নিশ্চয়ই আসবে সেখানে, চলুন আমরা গিয়ে বসি।"

সেই থাড্ডা পাহাড়। যে দিকটা পালামৌর দিকে তার কাছে অন্য পাহাড়ের কাছ ঘেঁসে একটি ক্ষীণ পার্বত্য স্রোতস্বতীর বাঁক ইংরিজি অক্ষর 'L'-এর মত। তারই কোণে বাঁধা হয়েছে অনুচ্চ মাচা। শিকারের মাচা এমনভাবে বাঁধতে হয় যাতে জঙ্গলের অন্যান্য গাছের মধ্যে মিশে থাকে, তাই অষ্টাদশ ফুটের বেশি উঁচু হয় না, শুদ্ধ চারটি খুঁটির উপর একটি ফ্রেম, শিকারী তার উপর বসলে দূর থেকে সদ্য কেটে আনা টাটকা ডাল পালা দিয়ে চারিপাশ ঘিরে দেওয়া হয়। সাধারণত মাটি থেকে আমরা জন্তু-জানোয়ারকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত তাতে রাতের স্বল্পালোকে বন্দুকের নিশানা ঠিকমত বসে না মাচা বেশি উঁচু হলে। লক্ষ্য বস্তু বা টারগেট্ যে কেবল নতুন রকম দেখায় তা নয়, জন্তুর যে অঙ্গ শিকারীর লক্ষ্যস্থল তা পাওয়া যায় না। স্বভাবত বন্য জন্তুর সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি সামনে ও চারিপাশেই দেখে, বিশেষ কোনও কারণে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হলে তারা উপরের দিকে চায় না। আমরা মাচার উপর গিয়ে বসলাম। সঙ্গের লোকজন সব চলে গেল। আমাদের বাঁ-পাশে একটা সতেজ রতেনের লতার ঝাড়। সামনে বালির উপর পড়ে রয়েছে মরা বজ্রকীটের লৌহবর্মের মত খোলস। দীপহীন রাতের আঁধারে সাদা-বালির উপর যখন বাঘ আসবে, সে সহজেই হবে আমাদের কাছে দৃশ্যমান। বজ্রকীটের ইংরাজি নাম 'এ্যাণ্ট ইটার'।

উৎসুক আগ্রহে বসে আছি আমরা দুজন। রাত গভীর হয়ে আসছে। শব্দহীন আঁধারের মাঝ থেকে হঠাৎ কানে এলো শুকনো

বালির উপর পায়ের শব্দ খস্ খস্ খস্। বুঝলাম সে আসছে, আশা করে রইলাম সামনের জলের ধারে সে আসবে, তা না এসে কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপরই রতেন লতার আড়ালে শুনি চক্ চক্ চক্। কালীবাবুর অজানতে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে কোন পাথরের ফাটলে ক্ষীণ জলধারা যে ওখানে আছে তা কে জানতো। বাঘ তাই খেয়ে চলে গেল, তাকে না গেল দেখা, না এল সামনে, আমাদের হিসাবে মস্ত ভুল হয়ে গেল। আশায় আশায় সারা রাত কেটে গেল, পূর্বাচলে আলোর আভাষ দেখা দিতে লোকজন এলো, সাড়া দিয়ে আমরাও নেমে এলাম। কালীবাবুর অনুশোচনার শেষ নেই, যাই-হোক তিনি বল্লেন, আজ রাত্রে জ্যান্ত মোষ বেঁধে ওকে মারবোই, আপনি সন্ধ্যার আগেই আসবেন।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। সারাদিন কাজ করে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগেই আবার গেলাম আগের দিনের সেই জায়গায়। একটি সবল মহিষ ও কয়েকজন লোক নিয়ে কালীবাবু আগেই অপেক্ষা করছিলেন। শিকারের নিয়ম শিকারে যে কাড়া বা মহিষ ব্যবহার হয় তা কখনও মেয়ে মহিষ হবে না। সাধারণত দুজন মহিষটিকে নিয়ে যায়, একজন নিয়ে যায় বড় একটি ধাতু নির্মিত ঘণ্টা এবং আরেক জন দূর থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় কচি ঘাস, পাতা তার খাবার জন্য, যাকে বলে ওরা 'পালরী'। যেখানে বাঁধা হয় সেখানকার ডাল-পালা ভাঙা হয় না পাছে সন্দেহের উদ্রেক করে। মাচার কাছে গিয়ে কালীবাবু বললেন, "কাল রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে আমার কাশী হয়েছে একটু, আজ আর শিকার নষ্ট করতে চাই না, দলেলওয়া রইল আপনার কাছে, আমি ফিরে চললাম।"

মোষ বেঁধে ডাল-পালা দিয়ে আমাদের ঘিরে দিয়ে তিনি সঙ্গের লোকজনদের নিয়ে খুব জোরে জোরে কথা বলতে বলতে চলে গেলেন, যেন আসপাশের জন্তুদের জানান দিয়ে গেলেন যে আমরা যাচ্ছি। তারা যাতে নিঃসন্দেহ হয় যে, বন এখন জনমানবহীন। আমাদের

মাচার সামনেই বাঁকের মুখে কিছুটা বালি খোঁড়া হয়েছে, তাতে বালির ভেতরে গোপন ছিল যে সিক্ততা তা জমে জল হয়েছে এবং ঠিক ওপারে সাদা বালির উপরের একটা ছোট শাল গাছকে মাটির থেকে ন-দশ ইঞ্চি গোড়া রেখে কেটে ফেলা হয়েছে। এই গোড়ার সঙ্গে শাম্বর হরিণের কাঁচা চামড়ার দড়ি দিয়ে মোষটির পা বাঁধা, যাতে বন্ধন দৃষ্টিগোচর না হয় বরং মনে হয় দল ছাড়া হয়ে রয়ে গেছে। মোষটির গলায় একটি বড় মত ঘণ্টা বাঁধা। ঘাস ও কচি লতাপাতা চারটি সামনের একটা গাছে উঁচু করে বাঁধা। যেই মোষটি মাথা উঁচু করে সে সব খেতে যাবে অমনি তার গলার ঘণ্টা বেজে উঠবে ও স্তব্ধ বনে বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত অনুরণিত হবে তার শব্দ এবং আকৃষ্ট করবে ক্ষুধার্ত বাঘকে।

লোকজন সব চলে যাচ্ছে। ও একা রয়ে গেল দেখে ভয়ার্ত মহিষ প্রাণপণে চেষ্টা করল তাদের সঙ্গে যেতে, চিৎকার করে ডাকল, যেন, বলতে চায় আমায় ফেলে যেও না, কিন্তু পা তার শক্ত করে বাঁধা, সে নিরুপায়। উঃ, মানুষ কি নিষ্ঠুর, কি উদাসীন! বনের মাথায় মাথায় রাঙা আলোর আবীর ছড়িয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। আঁধারের ঘন ছায়া নেমে এলো বনের উপর। প্রথমেই শোনা গেল নিস্তব্ধতা ভেদ করে সন্ধ্যার পাখীর ডাক "টুপু, টুপু, টুপু, টুপু"। ত্রাসে মহিষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে, শুনতে পাচ্ছি তার রুদ্ধ কণ্ঠের ভয়ার্ত শব্দ খাবি খাবার মত, কখনও বা এক ঝলক বাতাস দুলিয়ে দিয়ে যায় ডালপালা, শুকনো পাতা ঝরে পড়ে, তারি শব্দে চমকে ওঠে মহিষ, গলার ঘণ্টা বেজে ওঠে। মাটিতে বুক দিয়ে সে শুয়ে পড়ে যাতে শব্দ না হয় কিন্তু বেশিক্ষণ তো একভাবে পারে না থাকতে, আবার উঠে দাঁড়ায়। ক্ষুধার তাড়নেও বটে, নিজেকে ভোলাবার জন্যও বটে, সামনের লতাপাতা খেতে মুখ বাড়ায়, আবার ঘণ্টা বেজে ওঠে, আবার সচকিত হয়ে ওঠে সে। তার এই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যুর প্রতীক্ষা দেখে বুকের রক্ত প্রবাহ যেন থেমে এলো

আমার। ভগবান, একি পাপ করছি, একি নৃশংসতা। কিন্তু দ্বিতীয় মন তখনই আশ্বাস দেয়, হাতে বন্দুক আছে, ওকে মারবার আগেই বাঘকে শেষ করে দেব। দলেলওয়াকে বললাম, তুই ঘুমিয়ে নে, আমি বসে আছি। সে সোজা লম্বা হয়ে মাচার উপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল, যেন তার এই চির অভ্যস্ত শয্যা, এখানেই সে এমনি করে ঘুমোয়। নিশ্চল পাথরের মত বসে আছি। রাত প্রায় দশটা। আকাশে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। পাহাড় কাঁপিয়ে ডেকে উঠল হুতোম "দূরগুম"। উড়ে এসে সোজা বসল আমার মাচার বাঁ-পাশের খুঁটিতে, এতো কাছে যে হাত বাড়িয়ে তার মেটে রঙের উপর বাদামী ছিট ছিট দেহ ধরে ফেলতে পারি, সে টেরও পেল না আমার অস্তিত্ব। কিছু পরে তার সঙ্গীনী জলের ধারে বসে ডাকল 'ক'র্-র্-র্', উত্তর দিয়ে এ উড়ে গেল তার কাছে, তার ডানার ঝাপটা লাগল আমার গালে। তারা দূরে চলে গেল। মহিষের এতক্ষণে একটু আত্মবিশ্বাস এসেছে, ভাবছে এ যাত্রা হয় তো বেঁচে গেলাম। সে বসে রোমন্থন করছে। রাত প্রায় দুটো। আমাদের দক্ষিণে পাহাড়ের আড়ালে চাঁদ। দূর থেকে ভেসে এলো মৃদুস্বরে মন্দ্রকণ্ঠের "অ্যা-অ্যা-অ্যা"। কিছু পরে তারই প্রত্যুত্তর। বাঘের নানারকম ডাক আছে, এ-তারই এক রূপ। দলেলওয়ার গায়ে হাত দিলাম, সে যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে বসে কানের কাছে মুখ এনে বলল "আসছে।" অন্ধকারের পটভূমিকায় ঘনকালো চিত্র ফুটে ওঠে মহিষের, সেও অনড় নিঃস্তব্ধ, ভয়ে তার হৃৎস্পন্দন থেমে এসেছে। সর্বশক্তি সজাগ করে বসে রয়েছি। সামনে এলেই তাকে মারব, হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। দেখি মহিষটি লুটোপুটি খাচ্ছে বালির উপর এবং তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সাদা বালির উপর, তার মাথা থেকে মেরুদণ্ড ভিন্ন করে দিয়ে ব্যাঘ্র মহাশয় তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে অন্যদিকে চেয়ে পেছনের দুই পায়ের উপর বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে।

বন্দুক তুলে নিয়ে তার ঘাড় লক্ষ্য করে গুলি করলাম, লাফিয়ে উঠে সে পড়ে গেল, তার জীবলীলা শেষ। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বন থেকে বনান্তরে তখনও শোনা যাচ্ছে বন্দুকের গুলির প্রতিধ্বনি 'হা-হা-হা-হা', এমন সময় দেখি মহিষের মৃতদেহ কিসে যেন জোরে টানছে, কিন্তু শক্ত করে বাঁধা বলে তাকে মুক্ত করতে পারছে না। পড়্ পড়্ করে তার দেহ ছিঁড়ে ফেলছে। চেয়ে দেখি কালো ছায়া। কি ব্যাপার? ওই তো বাঘটা পড়ে। এটা কি? দেখি বাঘিনী। বন্দুক তুলে দ্বিতীয় গুলি, এরও প্রাণহীন দেহ শুয়ে পড়ল। একই রাত্রে প্রায় একই সঙ্গে প্রাণ হারাল দু'জনে।

মেঘ না চাইতেই জল। একটা বাঘ শিকার করতে এক জোড়া, খুবই আনন্দ হবার কথা এবং হয়নি যে সে কথা বলি না, কিন্তু সে সব নিষ্প্রভ করে গ্লানিতে মন ভরে উঠল যে নিরীহ জীবন্ত প্রাণীকে বেঁধে মারলাম, তার প্রাণরক্ষা করতে পারল না আমার আগ্নেয় অস্ত্র বা আমার শিকারীর দক্ষতা।

পাঁচ

বাঘ কার ?

কর্মক্লান্ত দিন শেষে মন চায় আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ প্রেমে স্নিগ্ধ ছুটির পরিবেশ। মাসের পর মাস আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সভ্য জগত থেকে বহুদূরে পালামৌর গহন অরণ্যে দিন যাপনের পর যেদিন সত্যিই হল সেট্‌লমেণ্টের কাজের অবসান, মন খুশিতে ভরে উঠল অচিরাগত ছুটির দিনের কল্পনায়। এমন সময় এলো আমার নির্বাসন দণ্ড সেট্‌লমেণ্ট অফিসারের হুকুম, "নগর উটারীতে মিঃ কুটস অনেক পিছিয়ে পড়েছেন, তোমার যখন কাজ শেষ হয়ে গেছে, সেখানে যাও মিঃ কুটসের সাহায্যে।" যাযাবর জীবনের ছোট-খাট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নতুন বনবাসের পথে।

ছোটনাগপুরের, বিশেষত পালামৌর প্রথম বর্ষা সত্যিই "খর প্লাবনা, নব যৌবনা বরষা।" নববর্ষার অবিরাম বর্ষণ এর প্রস্তরময় বক্ষে আনে সিক্ততার প্লাবন, পাহাড় ঘেরা ছোটনাগপুরে অজস্র পার্বত্য নদীর ধমনীতে আনে প্রাণের প্রবাহ, দগ্ধ শুষ্কপত্রহীন অরণ্য প্রকৃতিতে জাগায় যৌবনের পূর্ণতা সবুজের সুষমায়। প্রথম বর্ষার দুর্দমনীয় বেগে নগর-উটারীর বসনা বাংলার দক্ষিণে গাম্ভারিয়া গ্রামে যেখানে আমার ক্যাম্প ছিল, সে সব গেছে ভেসে, ক্যাম্পের ভেতর চলেছে পাহাড়ের গা ধুয়ে নেমে আসা জলের প্রবাহ, জিনিসপত্র নিয়ে টেবিলের উপর অনাহারে কদিন কাটিয়ে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছি অপেক্ষাকৃত উঁচু গ্রাম মেনার ডাক-বাংলোয় সহকর্মী মিঃ কুটসের পাশের ঘরে। তিনিও নিয়েছেন সেখানে আশ্রয়।

অ্যাটেসটেশানের কাজ চলছে। আস-পাশের গ্রাম থেকে রোজ প্রায় হাজার-বারশ' লোক এসে জড় হয়। একদিন সকালে এই কার্যোপলক্ষেই গ্রাম পরিদর্শনে গেছি, দেখি বাঘে একটি বড় বাছুর

মেরেছে। কাছে গিয়ে ক্ষত চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখলাম চিতা বাঘ। দীর্ঘদিন ধরে একই কাজ করে এসেছিল, তখন গতানুগতিকতার গ্লানি, শিকারের সম্ভাবনায় মন হয়ে উঠল চঞ্চল, মিস্টার কুটস যেখানে কাজ করছিলেন, সেখানে তাকে গিয়ে বললাম, চল আজ শিকার করা যাক, তিনিও সানন্দে রাজি হলেন, যারা সমবেত হয়েছিল, তারাও মহা উৎসাহে হাঁকোয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

পূব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে দোলায়িত পর্বত প্রাচীর এবং তারই প্রায় সমান্তরাল রেখায় রাজপথ করেছে তার সহগমন। আমাদের যেখানে গন্তব্য স্থান, সেখানে পূবের পর্বত শ্রেণী নত হয়ে এসে আবার উপরে উঠে গেছে পশ্চিমে। পাহাড়ের গায়ে নিচের দিকে শাল ও মহুয়ার এক একটা গাছ ছাড়া সবই প্রায় ছোট ঝোপ। উপরে ঘন শালের বন। আমাদের গম্যস্থানে একটি মাত্র মাচা বাঁধবার যোগ্য শাল গাছ, তাতে মাচা বাঁধা হয়েছে এবং তার প্রায় আশি গজ দূরে আরেকটি বড় পাথরের সামনে কয়েকটি সদ্য কেটে আনা শালের ডাল ঠেসান দিয়ে রেখে একটু অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। মিস্টার কুটসের কথামত লটারি করা হল, তাতে আমার ভাগ্যে স্থান হল কাটা শালের ডালের অন্তরাল। হাঁকোয়া সবে শুরু হবে, এমন সময় কয়েকজন এসে জিজ্ঞাসা করল, "বাবু হাঁকোয়া কি করব? চিতা নয়, বাঘ বড় বাঘ, আজ একই সঙ্গে ছ'টি বলিষ্ঠ মোষ মেরে ফেলেছে।" বললাম যে, "দেখলাম চিতার নখের চিহ্ন, বড় বাঘ কি রকম? জবাব এলো সে আলাদা, আপনি চলে আসার পর ছ'টি মোষ মেরেছে।"

শিকার বাঘের মজ্জাগত। সব সময় যে বাঘ তার অভাব মোচনের জন্য প্রাণী হত্যা করে তা নয়, সেটা তার খেলা, তার বিলাস। গতিশীল কিছু দেখলেই তার সখ জাগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার। এক পাল গরু-মোষ চরছে হয়তো, ঝাঁপিয়ে পড়ল একটার উপর, অন্যগুলি প্রাণ ভয়ে যে যেদিক পারল দৌড়ল, দেখে তার কৌতুক

আরো বেড়ে গেল, পর পর ছুটাছুটি করে আরো যে কটিকে পারল মারল। এই তার স্বভাব। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পালামৌ জঙ্গলে বড় বাঘ মারবার অধিকার তখন একমাত্র ইম্পীরিয়াল সার্ভিসওলাদের। স্থানীয় জমিদারেরা তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে শিকার করাতেন। আমার মত ছোট হাকিমদের এলাকার বাইরে বাঘ শিকার, সে কথা অবশ্য গ্রামবাসীদের জানা ছিল না, তাদের জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হল চিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, অত বড় বাঘের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত হবে কি? আত্মসম্মান সগর্বে মাথা তুলল, হলই বা বড় বাঘ, তাতেই বা কি? দ্বিতীয়ত যে বাঘ গরু-মোষ মেরে এতো ক্ষতি করছে, প্রজার এতো ভীতি উৎপাদন করছে, তাকে মারা অন্যায়? কখনই না। বললাম, হ্যাঁ, হাঁকোয়া কর।

বর্ষ শেষের তপ্ত এলোমেলো হাওয়া দোলা দেয় অরণ্যের শাখায় শাখায়, ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে জীর্ণ শুকনো পাতা পুরাতন বছরের সঙ্গী, স্তরে স্তরে বিছিয়ে দেয় ঝরা-পাতার আস্তরণ নবীনের আসার পথে। দোল-পূর্ণিমার দিন বা তার কিছু পরে এ অঞ্চলের অরণ্য-বাসীরা তাতে লাগিয়ে দেয় আগুন, ক্রমে দিনের পর দিন সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বন থেকে বনান্তরে। রাতের আঁধারে মনে হয় আলোর মালায় সজ্জিত পাহাড়ে বন। এমনি করে জ্বলতে থাকে আগুন প্রায় একমাস দেড়মাস পর্যন্ত। পাতা, ঘাস, ঝোপ হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন তার লেলিহান শিখার তাপে, নতুন পাতা মুষড়ে ঝরে পড়ে, তাও পুড়ে হয়ে যায় ছাই, শেষে বর্ষার শান্তিবারি সিঞ্চনে নিভে যায় সে আগুন। কত সময় দেখেছি, এ সময় শিকার করা বাঘ বা ভাল্লুকের পায়ের তলায় বড় বড় ফোস্কা। এই আগুন লাগানর কারণের জবাবদিহি হিসাবে গ্রামের লোকেরা অজুহাত দেয় যে, এই সময় মহুয়ার ফুল তলায় ঝরে পড়ে, পাতার উপর পড়লে খোঁজা অসুবিধা, তাই সব পুড়িয়ে তলাটা পরিষ্কার করে নেয়। আমাদের দেশকে বলা হয় দরিদ্র দেশ, কিন্তু দারিদ্র্যের চরম দেখেছি পালামৌর

গভীরে, জানি না পৃথিবীর অন্য কোথাও এর তুলনা আছে কিনা। অরণ্যচারী মানুষ যারা সভ্যজগত থেকে বহুদূরে বনের গহনে তাদের বাস, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার তাদের প্রতিবেশী, তারা তাদের রীতিনীতি বোঝে, জানে তাদের স্বভাবের ধারা, কিন্তু এ সভ্যজগতের মানুষকে এদের বড় শঙ্কা, বড় সন্দেহ। বনজাত ফল, ফুল, মূল খেয়েই এরা বেশির ভাগ জীবনধারণ করে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে। পুরুষরা পরে কৌপিন, নারীরা সামান্যতম আবরণে করে লজ্জা নিবারণ। স্ট্যাটিসৃটিক্স নিয়ে দেখা গেছে সাধারণত এদের এক পরিবারের সব গৃহ-সামগ্রী একত্রিত করলে পাঁচ আনা এক পয়সার বেশি মূল্য হবে না। একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম এদেরই একজনকে কবে শেষ ভাত খেয়েছিল। জবাব পেয়েছিলাম, পনেরো বছর আগে এক বিয়ের নেমন্তন্নে। শস্যের মধ্যে ভুট্টাই এদের খাদ্য।

যাই হোক, হৈ হৈ করে ঢাক-ঢোল শিঙা নাগাড়া বাজিয়ে দলবদ্ধভাবে গ্রামবাসীরা বন্য-জন্তু তাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের অভিমুখে পাহাড়ের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব-মুখে। যেখানে বসেছি তার পেছন দিকে একটি পাহাড়ের চূড়া উঠে গেছে। সামনের পাহাড়ের ঢালু গায়ে মহুয়া, মালের ইত্যাদি গাছতলার আগুন বর্ষায় নিভে গিয়ে ধোয়া পরিষ্কার। একটা পায়েচলা পথরেখা ওপারের পাহাড় থেকে নেমে এসে আমার সামনে ঘুরে পাস দিয়ে পেছনের পাহাড়ে উঠে গেছে। আমার ও মিস্টার কুটসের পাশে ইংরিজি অক্ষর ভি'র (V) মত কিছুদূর অন্তর অন্তর গাছের উপর কয়েকজন কয়েকজন করে লোক বসেছে। এদের বলে স্টপ্, হিন্দীতে 'রুক'। এদের কাজ হচ্ছে, এদের কারুর কাছে যখন বাঘ আসে তখন হয় হাততালি দিয়ে বা গাছের ডালে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে, শব্দ করে যাতে ভয় বা সন্দেহের কারণ আছে মনে করে বাঘ সে দিক থেকে ঘুরে আমাদের দিকে আসে। কিছুক্ষণ হাঁকোয়ার পরই আমার অনতিদূরে একজন এমনি শব্দ করতেই ধাঁউ করে এক

গর্জন শুনলাম, বুঝলাম বড় বাঘ। একটু পরেই দেখি প্রকাণ্ড বাঘ পায়ে চলা পথ বেয়ে ছুলকি চালে নেমে আসছে আমার সোজা। আমার কাছ থেকে যখন পঁচিশ-ছাব্বিশ ফুট দূরে, প্রায় আমার সমোচ্চ রেখায়, তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম। গর্জন করে লাফিয়ে উঠল সে যেন মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, তারপরই ক্ষিপ্রগতিতে কুটসের পাশ দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিৎকার করে বলে দিলাম, বাঘ "ঘায়েল" সব সাবধান। পাথর থেকে নেমে যেখানে বাঘকে গুলি করেছিলাম সেখানে গেলাম, দেখলাম চারিদিকে রক্ত ছিটকে রয়েছে, আর রয়েছে একটুকরো পাত্‌লা হাড়। কোথায় লাগল, মারলাম মাথা লক্ষ্য করে, এ হাড় কিসের? কুটসকে জিজ্ঞাসা করলাম, মারলে না কেন তোমার সামনে যখন গেল, প্রত্যুত্তরে বলল, "হ্যাঁ, জখম বাঘকে মারতে গিয়ে প্রাণ হারাই।" স্থানীয় জমিদারবাবু গরুড় দেও সিংয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রামনাথ সাহসী যুবক। এগিয়ে এলো, চলুন না হুজুর ওর খোঁজে যাই। গুলি ওর লেগেছেই কিন্তু সেদিন তার পেছনে ধাওয়া করা সমীচীন মনে করলাম না। একে, প্রথা বিরুদ্ধভাবে শিকার করতে গেছি, তায় বাঘ জখম হয়ে গেল, জখম বাঘ সাক্ষাৎ মৃত্যু, যদি কাউকে মেরে ফেলে, এই সব নানা চিন্তায় বিমর্ষ মনে, সব শিকারীদের আগে বন থেকে বের করে বেরিয়ে এলাম ফিরে।

পর দিন রামনাথ এসে বলল, রক্তের বিন্দুতে গতিপথ চিহ্নিত করে ক্ষেত পার হয়ে ঘায়েল বাঘ পাশের পাহাড়ের শালবনে আশ্রয় নিয়েছে। গুলি তার এমন জায়গায় লেগেছে যেখানে সে চাটতে পারে না, তাই বালিতে লুটোপুটি করেছে—তার চিহ্ন বর্তমান। যে পাহাড়ে সে গেছে সেই পাহাড়ের চূড়ো থেকে স্থান ভ্রষ্ট হয়ে মস্ত পাথর একটি গড়িয়ে নামার পথে যেন থমকে থেমে গেছে পাহাড়ের মাথায় এবং তারই গায়ে এসে হেলে পড়েছে আরও বড় বড় তিন চারটি প্রস্তর খণ্ড এবং কয়েকটিতে মিলে একটি ছোট গুহার মত রচনা

করেছে। তারই অন্ধকারে মাছি থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছে সে, যত দিন ঘা না সারে বা মৃত্যু এসে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, সে ওখান থেকে নড়বে না। দুঃখের দিনে মানুষ যেমন খোঁজে তার গৃহকোণ, জন্তু-জানোয়ারেরাও তেমনি খোঁজে তাদের পরিচিত নিরাপদ স্থান।

মিঃ কুটসকে বললাম, চল ওর খোঁজে যাই। তিনি বললেন, দেখো আমি সূর্যাস্ত আইন (Sun set law) জানি। যেদিন বাঘকে গুলি করেছ সেদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত যেই মারুক বাঘ তোমার, কিন্তু যদি আজ আমি মারি তাহলে বাঘ কার ? বললাম সে মীমাংসা পরে হবে, আগে গ্রামবাসীদের বিপদের কারণ ওকে তো শেষ করা যাক, তুমিই না হয় নিয়ো। তখনই উভয়ের সম্মতিক্রমে স্টেটস্‌ম্যান কাগজে লিখে পাঠালাম, কার বাঘ ? (Whose tiger ?) সব অবস্থা জানিয়ে নিচে নাম স্বাক্ষরের পরিবর্তে দেওয়া হল 'পালামৌর' শিকারী। কুটস সাহেব রাজি হলেন। এখানে বলে রাখি অনেক দিন পর্যন্ত এই নিয়ে নানা মতামত প্রকাশিত হল এবং শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয় প্রথম গুলি যার, বাঘ তারই।

যে পাহাড়ে বাঘ, সে পাহাড় ও পাশের পাহাড়ের তরঙ্গের মাঝ দিয়ে উটারী নগরের পথ চলে গেছে বেঁকে। প্রায় এক হাজার গ্রামবাসী তাদের সব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পাহাড়টিকে ঘিরে হাঁকোয়া করতে করতে উপরে উঠে যাবে ঠিক হল। বাঘের আশ্রয়ের উল্টোদিকে যে পথে তার বেরিয়ে আসবার কথা, সেখানে শালবনের ধারে পাহাড়ের গায়ে অপ্রশস্ত একটু সমতল স্থানে দেখা গেল এবারও মাত্র একটি মাচা এবং এবারও লটারি করে সেটি পড়ল কুটসের ভাগ্যে। কাছেই একটি বড় কোমর সমান উঁচু প্রস্তরখণ্ডের উপর বসলাম।

দূর থেকে শুনছি রামসিঙার বিচিত্র সুর, ঢাক-ঢোলের শব্দের সঙ্গে হাঁকোয়ার কোলাহল। ক্রমে শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে এলো, হাঁকোয়ারা প্রায় পাহাড় চূড়ায় এসে গেছে। হঠাৎ দেখি, গুহার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো আহত বনরাজ, হাল্কা বাদামী রঙের

উপর কালো ডোরা পরিষ্কার দৃশ্যমান, মুখ ঈষৎ খোলা এবং মুখের চারপাশটায় কালো রেখা দেখা যায় এবং তার যৌবনদন্ত দুটি, লম্বা লেজটি পেছনে অর্ধচক্রাকারে অবনমিত, পেছনের বাঁ-পা টেনে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। গুহার আশ্রয় ছেড়ে কয়েক-পা এগিয়ে এসে আবার ফিরে গেল গুহার দিকে, আবার বেরিয়ে এলো, যেন ঠিক স্থির করতে পারছে না গুহার আশ্রয়ই নিরাপদ না সে আশ্রয় ত্যাগ করে পলায়নই শ্রেয়। শেষ পর্যন্ত কুটসের মাচার দিকে ঘুরে গেল। পাশে বন্দুক নামিয়ে রেখে ঘুরে বসে অপেক্ষা করে আছি ঐ বন্দুকের শব্দ হয় এই আশায় উৎকণ্ঠ হয়ে কিন্তু কোন সাড়াই নেই। পেছন ফিরতেই দেখি সামনে আমার থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে বাঘ গুহার দিকে ফিরে চলেছে। কুটসের সামনে দিয়ে গভীর খাদ বেয়ে আমার অলক্ষ্যে নেমে অনতিদূরে এসে গেছে, তাড়াতাড়ি বন্দুক আমার পুরণো বন্ধু Jeffry's cordite '333 bore তুলে নিলাম এবং গুলি করলাম। বিকট গর্জন করে সে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে পড়ে গেল এবং পরক্ষণেই সেই পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে গেল, দ্বিতীয়বার আমার বন্দুক অগ্নি উদ্গীরণ করল, দেখলাম গুলি লাগল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সোজা উঠে পাথর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিৎকার করে বললাম, বাঘ ফিরে যাচ্ছে, যে যেখানে পার পালাও। হাঁকোয়ার অত কোলাহল মুহূর্তে থেমে যাওয়াতে বনের স্তব্ধতা দ্বিগুণিত হয়ে অনুভূত হল। অত্যন্ত বিরক্ত কুটস বললেন, "তুমি আজকের শিকারই নষ্ট করলে। ও যেত কোথায়? কাছে আসতই। তখন মারতাম, সব পণ্ড করলে।" বলে দ্বিরুক্তি না করে ফিরে চলে গেলেন। আজও বিফল হব? কখনই না। মৃত্যুপণ করে স্থির করলাম আজ এর শেষ করবই, হয় আহত বাঘকে শেষ করব নয় জীবন দিতে হয় দেব। বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লাম তার সন্ধানে। সঙ্গে চলল অসীম সাহসী রামনাথ। একটি ক্ষিপ্রগতি তরুণ চলল সঙ্গে, যে আমাদের সঙ্কেতে গাছে উঠে চারিদিক দেখে ইসারায় জানায় বাঘ দৃষ্টি সীমার ভেতর

আছে কিনা এবং আবার নেমে আসে। এমনি করে যে-পথে বাঘ অদৃশ্য হয়েছে সেই পথে চলেছি। চার-পাঁচবার কোনও হদিস না পাবার পর দেখি সামনে একটি বড় পাথর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে, তারই গায়ে একটি ক্ষণ-ভঙ্গুর গল্‌গল্‌ গাছ—তাতে উঠেছে তরুণটি। উপরে উঠেই দ্রুত মাথা নিচু করে দেখাল পাথরের ওপাশে বাঘ শুয়ে। বন্দুক নিয়ে সজাগ হয়ে তার হাতে তুলে দিলাম একটি পাথরের টুকরো ওর গায়ে ফেলতে। ফেলেই মাথা নিচু করল যাতে দৃষ্টিগোচর না হয় কিন্তু কোনও সাড়া নেই। আবার দিলাম আরেকটি টুকরো, এতেও কোন সাড়া নেই, তখনই লাফিয়ে উঠে পড়লাম পাথরটির ওপর। পার হয়ে দেখি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বাঘ দশ ফুট আড়াই ইঞ্চি লম্বা, চিরনিদ্রায় অভিভূত। আমার দুই গুলিই বিদ্ধ করেছে তাকে। সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠল। মহা উৎসাহে ছোট শালগাছ কেটে মই মতন তৈরি করে তার উপর রেখে ষোল জন মিলে বহন করে নিয়ে গেল তার দেহ। পরে দেখা গেল প্রথমদিনের মাথা লক্ষ্য করা গুলি তার বাঁ কানের পেছনের চামড়া ভেদ করে বাঁ পায়ের থাবায় লেগেছে।

ছয়

বন্ধু ইয়াকুব খান্‌

উৎসব যেমন একলার নয়, আনন্দের অংশে তাতে আছে সকলেরই সমান অধিকার, শিকারেও তেমনি। শিকারের আনন্দ শুধু মাত্র শিকারীর নয়, যাঁরা এতে সঙ্গী হন বা যে কোনওভাবে অংশ নেন, শিকার তাঁদের সকলেরই। পৌরাণিক যুগে শিকারকে অষ্টাদশ ব্যসনের এক ব্যসন বলে গণ্য করা হত। আধুনিক যুগে অবশ্য একে বলা হয় স্পোর্ট বা খেলা। খেলার মাঠে যারা খেলোয়াড়, হার-জিত তাদের তো আছেই, কিন্তু খেলার উত্তেজনাই মুখ্য। দর্শকদের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হবে হার-জিতের আনন্দ বা নিরাশা যেন একান্ত তাদেরই। শিকারের কতকগুলি লিখিত এবং অলিখিত নিয়ম আছে। মেয়ে বাইসন, মেয়ে হরিণ বা হরিণ শিশু শিকার আইনে অবধ্য। বছরের যে-যে সময় পশু পক্ষীর নীড় রচনার বা সন্তান সম্ভাবনার সময় সে-সে সময়ও শিকার নিষিদ্ধ সংরক্ষিত বনে শিকার আইনবিরুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া যে সত্যিকারের শিকারী তার পালনীয় কতকগুলি নিয়ম আছে যা অলিখিত এবং তা পালন করবার ভার তার নিজের। যেমন, আহত জন্তুকে তিলে তিলে মরতে না দিয়ে তাকে খুঁজে বের করে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটান তার জীবন শেষ করে, থাক না তাতে প্রাণ সংশয় বিপদের সম্ভাবনা। একই সঙ্গে দুজনে গুলি করবে না, অপরকে সুযোগ দিয়ে তারপর নিজে। প্রথম গুলি যার লাগে শিকার তারই, যদি সে পরে অপরের গুলিতে প্রাণ হারায় তাহলেও।

১৯২৬ সালের বর্ষাশেষে একদিন সবে মফঃস্বলের কাজ থেকে হাজারিবাগে বাড়ি ফিরছি, গাড়ি থেকে নামতেই দেখি সূর্য সিং দাঁড়িয়ে। সূর্য সিং ডেপুটি কমিশনারের আর্দালি, জাতে রাজপুত, ভদ্রসন্তান। এগিয়ে এসে বলল, বাঘে তার গরু মেরে গেছে

সেদিনই। হাজারীবাগ থেকে চাত্রার পথে শহর থেকে আট মাইল দূরে তাদের গ্রাম, তারই উপকণ্ঠে ঘটে গেছে ঘটনাটি। খোলা জায়গা থেকে বাঘ কোনও ফাঁকে এসে তার শিকার না নিয়ে যায়, এ জন্য লোক পাহারায় রেখে সে ছুটে এসেছে আমার কাছে। দুপুরের সূর্য তখন পশ্চিমের পথে, সন্ধ্যা হতে তখনও কিছু বাকি আছে। আর দেরি না করে তখনই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে চলল আমার ভাগিনেয় শচীকান্ত—শিকারের আশায় উদ্‌গ্রীব।

উঁচু নিচু তরঙ্গায়িত ভূমি ও শালবনের ভেতর দিয়ে হাজারিবাগ থেকে চাত্রার দিকে যে রাজপথ চলে গেছে, তা থেকে আধ মাইল দূরে ছ-সাত ঘর ভুঁইয়ার বসতি নিয়ে ছোট গ্রামখানি, নাম সিমেরিয়া। ছোট ছোট মাটির কুঁড়েগুলির পাশেই সরু ডাল-পালার বেড়া, সিমের লতায় ছেয়ে আছে। দুপাশের বেড়ার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে ঢালুবনের দিকে গ্রাম্য পথ নেমে গেছে। গ্রামের প্রায় লাগা কয়েকটি ক্ষেত ধাপে ধাপে নেমে গেছে, বর্ষাশেষের সবুজ। ক্ষেত-গুলির শেষেই শুরু হয়েছে পুটুসের বন, করমচার ঝোপ, ভেলার বড় বড় পাতাওলা গাছ, বড় কাটা শালের গোড়া থেকে বেরুনো, পাৎলা পাৎলা শাল গাছ। বর্ষার জলধারা গ্রাম ধুয়ে সরু সরু খোয়াইয়ের পথ বেয়ে নালা হয়ে বয়ে চলে গেছে বনের ভেতর। গ্রাম থেকে দু-শ' গজ দূরে নালাটির ধারে পড়ে রয়েছে মরা গরুটি আর তারই পূবে নালার উপর হেলে পড়া প্রায় ছোট একটি ডুমুর গাছ, যার তলা পুটুসের ঝোপে ছেয়ে আছে। এই অনুচ্চ ডুমুর গাছটি ছাড়া কাছে-পিঠে কোথাও না আছে কোন গাছ, না কোন আত্মগোপন করবার মত বড় ঝোপ। পশ্চিমের আকাশে তখন পড়ন্ত রোদ, আমরা ডুমুর গাছে উঠলে পশ্চিমের আলো আমাদের করে তোলে প্রকট, কিন্তু বাঘের দিকে নিশানা করবার সময় আমাদের লক্ষ্য পড়ে আলোর সোজা। কিন্তু তখন কোন চিন্তা করবার সময়ও নেই এবং অন্য কোনও উপায়ও নেই দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম সেই ডুমুর

গাছে। একটা দো-ডালাকে আশ্রয় করে বসা গেল। আমি গাছে উঠতেই শচীর সঙ্গে গ্রামের যারা এসেছিল তারা চলে গেল।

গ্রামে তারা পৌঁছয়নি এমন সময় দেখি বাঘ আসছে। সন্ধ্যার ক্রমবিলীয়মান আলো তখনও আঁধারে মগ্ন হয়ে যায়নি, চারিদিক হয়ে এসেছে অস্ফুট আবছা, এরা যাকে বলে 'ঝোলকোল।' সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় যার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তার দু-পায়ের নরম সাদা রোঁয়া, হলদে কালো ডোরা অন্ধকারে মিশে গেছে। স্বভাবত বাঘ খোলা জায়গায় বসে তার শিকার খায় না, তাকে দ্রুতবেগে নিয়ে যায় বনের মধ্যে কোন নিরাপদ স্থানে, যেখানে সহজে দৃষ্টি চলে না, সেখানে বসে ইচ্ছামত খায়। সে এসে দাঁড়াতেই তাকে সে অবকাশ না দিয়ে আমি তুলে নিলাম বন্দুক এবং এক গুলি। বিকট গর্জন করে লাফিয়ে উঠল সে, এবং মাটিতে গোল হয়ে পায়ের কাছে মাথা এনে তালগোল পাকিয়ে গড়াগড়ি করে পড়ল জলে, ঠিক আমাদের নিচে। পুটুসের ঝোপে কিছুই দেখা যায় না, তার

পরই অদৃশ্য। বনে বনে কেঁপে উঠল তার গর্জনের বেগ। চিৎকার করে গ্রামবাসীরা জানতে চাইল ফলাফল, বললাম, বাঘ জখম হয়েছে সাবধান। অন্ধকারে তখন করার কিছুই নেই তাই ফিরে এলাম। পরদিন আলো হবার সঙ্গেই গেলাম সেখানে। বাঘকে যেখানে গুলি করেছিলাম সেখানে গিয়ে দেখি অনেকটা রক্তের দাগ, গুলি তাকে বিদ্ধ করেছে। নালা পার হয়ে ওপারে দেখি ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ এবং তার পায়ের চিহ্ন। দেখে বুঝলাম গুলি তার একটা পা জখম করেছে। স্থির করলাম তাকে খুঁজে বার করে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাব।

কোথাও বা শুকনো পাতার উপর, কোথাও বা ঘাসের উপর রক্তের দাগ অনুসরণ করে চললাম তার খোঁজে। একটু দূরে গিয়েই ওপারের অসমতল পার্বত্য প্রদেশ বন্য শিউলির বনে ভরা। যাঁরা বন্য শিউলি দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, গাছগুলি সাত আট ফুটের বেশি উঁচু হয় না এবং ঘন ডালপালায় ছাওয়া ঝোপের মত হয়। বর্ষার পত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ, আসন্ন শরতের আগমন সূচনা করছে দু চারটি ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধ। এই শিউলি বনের ভিতর দৃষ্টি চলে না। ঘায়েল বাঘ সাক্ষাৎ কালান্তক, সে যে কোথায় বসে আছে দেখবার উপায় নেই, অথচ এই বনব্যূহের অন্তরালে থেকে সে আমাদের সব গতি লক্ষ্য করছে এবং কোন্ মুহূর্তে সে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কোনই স্থিরতা নেই। অতি সাবধানে তাই বসে বসে গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হতে লাগলাম আমরা বাঘের রক্তবিন্দুর চিহ্ন অনুসরণ করে। জমির নিম্নমুখী গতি দেখে বুঝলাম, কাছেই কোথাও নদী আছে। সঙ্গে সূর্য সিং ও দুঃসাহসী দু-একজন যারা ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। শিউলি বন এড়িয়ে একটা ঘুর পথে সোজা নেমে গেলাম সেই পার্বত্য নদীটিতে। ক্ষীণ পার্বত্য নদী, বর্ষার জলধারা এনে দিয়েছে তার ধমনীতে প্রাণের প্রবাহ। অনুসন্ধান করতে লাগলাম পদচিহ্নের—যে সে পার হয়ে গেছে কিনা। একটু দূরে গিয়েই দেখি এক জায়গায়

নদীর জল তখনও ঘোলা হয়ে রয়েছে এবং ওপারেই তার পায়ের আবার দাগ এবং তাজা রক্তের চিহ্ন। বুঝলাম, সে আমাদের আসার একটু আগেই নদী পার হয়ে গেছে, তারই চলায় ঘুলিয়ে ওঠা নদীর লাল মাটি তখনও থিতিয়ে বসবার অবসর পায়নি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ন'টা। সেদিন বেলা এগারটায় রাঁচিতে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবার কথা বিশেষ জরুরী কাজে, এবং পালামৌ-ডাল্টনগঞ্জে যেতেই হবে, কাজেই একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে ফিরে যেতেই হল, অনন্যোপায় হয়ে। চারপাশের গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে দিলাম বাঘ "ঘাহিল", তারা যেন গরু, মোষ চরাতে বা কাঠকুটো সংগ্রহ করতে বনে না যায়। আমি পরের দিন ফিরেই আবার আসব।

দুদিন পরে মনের দুর্দমনীয় আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে ফিরে এলাম। যাবার দিন বন্ধু ইয়াকুব খাঁকে শিকারের বার্তা পাঠিয়ে গিয়েছিলাম, বলেছিলাম তিনি যেন সিমেরিয়ার আগের পথের বাঁকে সুলতানা গ্রাম সীমানায় অপেক্ষা করেন। হাজারিবাগ থেকে ছ-মাইল দূরে ক্ষুদ্র গ্রাম হেদলাগের তিনি জমিদার। স্বল্পভাষী, উদারচেতা, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজারই তিনি শ্রদ্ধার্হ। গ্রামের কোথাও কোন মতবিরোধ হলে তাঁর কাছে আসে মীমাংসার জন্য। ১৯১১ থেকে আজ পর্যন্ত ইনি আমার অকৃত্রিম সুহৃদ। শিকারে সখ এঁর প্রচুর। ইনি সেই জাতের শিকারী, যাঁরা গুলি বৃথা অপচয় করেন না। যেখানে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছোঁড়েন সেখানে অব্যর্থ এবং যত বড় ভয়াবহ পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হতে হোক, সঙ্গীকে ফেলে পেছন ফেরেন না। যাই হোক, শচীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম আহত ব্যাঘ্রের সন্ধানে, এবং দেখলাম ঠিক সময়ই খাঁ সাহেব পথের ধারে অপেক্ষা করে আছেন।

আমরা তিনজন চলেছি বনের ভেতর। আমার হাতে এক্সপ্রেস ৫০০ রাইফেল, খাঁ সাহেব ও শচীর সঙ্গী ১২-বোর দোনালা বন্দুক।

আমাদের সঙ্গে চলেছে সূর্য সিং ও দুটি বৃক্ষারোহণপটু যুবক। আগের দিন যেখান থেকে ফিরে গেছি সেখানে গিয়ে ভেবে দেখলাম বাঘের গুলি যদি এমন জায়গায় লেগে থাকে যেখানে সে চাটতে পারে না, তাহলে সে বেছে অন্ধকার গর্তে মাছির হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে। মাংসভোজী জীব যারা তাদের রক্ত সহজে বন্ধ হয় না, যত সহজে শাক বা তৃণভোজীদের হয়। কিন্তু তার পদচিহ্ন দেখে বুঝলাম যে, সে নদী পারের শালবনে ঢুকেছে। ভিজে মাটিতে যেখানে তার চার পায়ের দাগ পড়েছে সেখানে দেখলাম যে, সামনের ডান পায়ের ছাপ হাল্কা—তার মানে জখম ওই পায়ে, তাই ভর সয় না। অন্য পায়ের তুলনায় তাই এ-পা চালনা করবে কম এবং স্বভাবতই গতি হবে দক্ষিণাবর্তে। দক্ষিণে চেয়ে দেখি অজস্র খোয়াইয়ের বলিরেখা ও ঘন শালবনে ভরা। খোয়াইয়ের গায়ে ছিটন অভ্রের কুঁচিগুলি সকালের আলোয় ঝিকমিক করছে। সে তাহলে নিশ্চয়ই শালবনের গহনে আশ্রয় নিয়েছে অনুমান করলাম। যুবক দুটি এক-একটি গাছের উপর উঠে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে বাঘের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় কিনা এবং সেই অনুসারে আমরা অগ্রসর হই। হঠাৎ একজায়গায় দেখি ঝরা পাতার উপর এক ফোঁটা তরল রক্ত, একটু আগে যে সে সেখানে ছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারই আসে-পাশে খুঁজতে চোখে পড়ল তার বসার দাগ, যেখানে সে 'মাটি নিয়েছিল' এবং পাতার উপর শুয়েছিল। শালবনের ওপারে একটি ছোট কচ্ছপাকৃতি টিলা শালবনে ছাওয়া, মনে হল সেখানে ঢুকেছে। অদূরে শিকারী গ্রামবাসী যারা অনুসরণ করছিল তাদের ডেকে বললাম, ছোট টিলা বা পাহাড়টি ঘিরে ফেল এবং হৈ হৈ করে হাঁকোয়া কর। বন্দুকের শব্দ পেলেই যে যেখানে পারবে গাছে উঠে পড়বে, আমাদের সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত নামবে না। ইতিমধ্যে আমরা অন্যদিক দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে পাহাড়ের পশ্চিমে নেমে গেলাম, যেখানে জঙ্গল ক্ষীণ হয়ে এসে কিছুটা পরিষ্কার জায়গা, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করে দাঁড়ালাম মাটিতে। খাঁ সাহেব ও

শচীকে বলে দিলাম বন পার হয়ে খোলা জায়গায় না বেরুন পর্যন্ত বাঘকে গুলি না করে, কারণ একে তো ঘায়েল বাঘ, অসম্ভব হিংস্র, তারপর সে যদি না মরে, ফিরে যায়, সামনে হাঁকোয়া করছে যারা তাদের যাকে পাবে মেরে বেরিয়ে যাবে, কোন বাধা মানবে না। শিকারীর নিজের প্রাণ ছাড়া যারা সঙ্গে আসে সকলেরই প্রাণের দায়িত্ব তার।

বনের সোজা মুখো-মুখি দাড়ালাম আমি। আমার দুই পাশে কিছু দূরে খাঁ সাহেব ও শচী। হাঁকোয়া শুরু হয়েছে, আমরাও প্রস্তুত। কিছু পরে দেখি বন থেকে বেরিয়ে এলো সে। নধরপুষ্ট দেহ, রোদ পড়ে চক্‌চক করছে তার মসৃণ গা। মস্ত বাঘ। সামনের ডান পা আমার প্রথম দিনের গুলিতে একেবারে ভেঙ্গে গেছে এবং রক্ত ঝরছে, রক্ত-ক্ষরণে দুর্বলও হয়েছে কিছুটা, তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা চলে আসছে আমার দিকে, চোখে তার হিংসার আগুন। ঘায়েল বাঘকে মারবার সময় যথাসবম্ভব কাছ থেকে মারা উচিত, কারণ নিশানা করবার সময় কাছে যদি লক্ষ্যের তফাত হয় ইঞ্চির ভগ্নাংশ, দূরে সেই তফাৎই হয়ে দাঁড়ায় কয়েক ইঞ্চি। গুলি যদি কোন রকমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে হিংস্র বাঘ ফিরে গিয়ে হাঁকোয়াদের উপর মৃত্যু হেনে চলে যায়। আমি তাই স্থির প্রতীক্ষায় আছি যে, আরো কাছে আসুক। তার ওই হিংস্র মুর্তিতে আমার দিকে এগিয়ে যাওয়া দেখে খাঁ সাহেব আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, তাঁর দোনালা বন্দুক গর্জন করে উঠল। পড়ে গেল বাঘ এবং সগর্জনে ঝটাপটি করতে লাগল। দেখলাম মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী, আরও গুলি করে চামড়া নষ্ট করা বৃথা। কাছে এগিয়ে গেলাম, ক্রমে তার ছটফটানি এলো থেমে, প্রতিহিংসাপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিন্তু সে তখন অশক্ত। ক্রমে তার চোখ এলো বুঁজে, চিরনিদ্রায় হল তার যন্ত্রণার অবসান।

যার ভয়ে গ্রামশুদ্ধ লোক এতদিন তটস্থ ছিল, আজ তার সব উপদ্রব, সব হিংস্রতার শেষ জেনে গ্রামবাসীরা এসে ঘিরে দাঁড়াল তার বিশাল মৃতদেহ।

সাত

স্যার এডোয়ার্ড গেট

১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৮ সালের শেষ পর্যন্ত সেট্‌লমেণ্টে থাকার সময় পালামৌর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অনেক ঘুরলাম। এই সময় পালামৌর রহস্যময় বনকে এবং তার আশ্রিত পশু-পক্ষীদের, তার ক্রোড়ে পালিত অরণ্যবাসী মানুষকে ভাল করে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেলাম। শিকার ও জন্তু-জানোয়ারের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম এবং আমার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছিল স্থানীয় অরণ্যবাসী যে সব গুরুরা তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

১৯১৮ সালে খাস মহলের কাজে নির্বাচিত হয়ে পালামৌতে বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দলাল সিংহের কাছ থেকে কার্যভার নিলাম। ছাত্র জীবনে আমরা ছিলাম সমসাময়িক, যদিও আমরা বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছাত্র। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের এবং নন্দবাবু স্কটিশ চার্চ কলেজের। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেদীপ্যমান ছাত্র এবং ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনেও চিরদিন মা সরস্বতীর সেবা করে গেছেন এবং তাই ছিল তাঁর জীবনের অঙ্গ। এ ছাড়া তিনি পরম বৈষ্ণব। আমি যে সময় পালামৌ খাসমহলের কাজে যাই তার মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে বড়দিনের ছুটি যাপনের প্রমোদ হিসাবে পালামৌর জঙ্গলে প্রাদেশিক গভর্নরের শিকারের প্রচলন হয়। জঙ্গল প্রায় সবই খাস মহলের আয়ত্তে কিন্তু খাস মহল অফিসার নন্দবাবুর শিকারের নেশা বা কোন সখই ছিল না, তাই শিকারের যা কিছু বন্দোবস্তর ভার পড়ে এস-পির উপর ইনস্পেক্টর মৌলবী ওজিউদ্দীনের মাধ্যমে। গভর্নরের শিকার-ক্যাম্পের অন্যান্য যা ব্যবস্থা এবং রসদ ইত্যাদি সংগ্রহের ভার অবশ্য খাস মহলের ছিল এবং তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত সব সম্পূর্ণ করতেন।

সে বছর বড়দিনে স্থির হল পালামৌর কেড়ের জঙ্গলে শিকারের আয়োজন হবে। এই আয়োজন করারও পদ্ধতি ছিল। জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে যারা শিকারী এবং জন্তু জানোয়ারের ভাবধারা রীতিনীতি জানে, তারা আগে সংবাদ সংগ্রহ করতো কোথায় কোথায় কি জানোয়ার আছে, পদচিহ্ন দেখে হিসেব করে সঠিক সংবাদ দিত কোথায় বাঘ আছে, বাঘ না বাঘিনী, সঙ্গে বাচ্চা আছে কিনা, কটা, তারা কোথায় জল খাবে, কোন্ পথে আসবে সমস্ত। সেই অনুসারে শিকারের মাচা তৈরি হত। মাচার চারটি খুঁটির দুটি বা অন্তত একটি খুঁটি হত কোন সজীব গাছে। আট-দশ ফুট মাটি থেকে উঁচুতে যেখানে গাছের দো-ডালা বেরিয়েছে সেইখানে মঞ্চ বা মাচা প্রস্তুত হত। এদিকে রাজভবন থেকে নামের তালিকা আসতো কজন শিকারে আসবেন, কে কে আসবেন এবং মাচার সংখ্যাও সেই অনুসারে তৈরি করে আরো দু-একটি বেশি করা হত। তারপর কদিন ধরেই যেখানে যেখানে মাচা সেখানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মোষ বাঁধা হত। বাঘে মোষ মারলেই খবর আসতো এবং যেখানে মোষ মেরেছে সেখানে শিকারে যাওয়া হত।

যেদিন গভর্নর সদলবলে আসবেন সেইদিনই সকালে খবর পেলাম বেৎলার 'বলাহি কুসুম' জঙ্গলে বাঘে মোষ মেরেছে। সোজা চলে গেলাম ডাল্টনগঞ্জ স্টেশনে। তাঁরা এসে পৌঁছেচেন, গভর্নর স্যার এডোয়ার্ড গেট, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী, চীফ সেক্রেটারী এ-ডি-সি, এস-পি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে উপস্থিত তাঁদের সম্বর্ধনার জন্য। শিকারের সাজ-সরঞ্জাম বন্দুক, ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে উৎসুক হয়ে অপেক্ষমান শিকারের সংবাদের প্রতীক্ষায়। আমি যেতেই মিঃ ফিলকী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে স্যার এডোয়ার্ড গেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার চাকরির মূলই তিনি, কাজেই পরিচয় আগেই হয়েছিল। যাই হোক, আর পরিচয় হল তাঁর চীফ সেক্রেটারী মিঃ ম্যাকফার্সনের সঙ্গে। বেৎলার জঙ্গলে

মোষ মারার কথা বলতেই তিনি সহাস্য মুখে প্রশ্ন করলেন, 'সে বন তোমার জানা?' বললাম, 'মৌলবী ওজিউদ্দিনই প্রথানুসারে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন, তিনিই সংবাদ দিয়েছেন। তবে সমস্ত বন সঠিক না জানলেও শিকারের জায়গা আমার মোটামুটি জানা।' 'দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাঘ মেয়ে না পুরুষ?' সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করে যাইনি; কাজেই সঠিক বলতে পারলাম না।

আগে আগে পথ দেখিয়ে চললাম আমার মোটর-বাইকে, পেছনে চলল তাঁদের মোটর। যেখান থেকে হাঁটা পথ ধরতে হবে, সেখানে নেমে সকলে চললাম হাঁটা-পথে, একজনের পেছনে একজন—এই রকম সারিবদ্ধভাবে নিঃশব্দে মৌলবী ওজিউদ্দিনের অনুসরণ করে আমরা চললাম। খুব ঘন-জঙ্গল। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় নানারকম গাছ, তারি ভেতর দিয়ে চোখে পড়ার মত কোন পরিবর্তন না করে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে পথ করা হয়েছে। প্রখর দিবালোকেও ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার। মাচার কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। পর পর সব মাচা, কোনটা বা একটু উঁচু জায়গায়, কোনটা বা নিচে, যেমন যেমন সুবিধামত জায়গা তেমন তৈরি করা প্রায় একই সারিতে যথাসম্ভব। প্রত্যেকেই সব মাচার, স্থিতি দেখে নেয় বসার আগে, যাতে গুলি কোনমতে অন্য মাচায় না লাগে ভুলক্রমেও। প্রত্যেকে নিজের নিজের মাচার মোড়া ও বন্দুক নিয়ে উঠে গেলেন। সর্বপ্রথম প্রাইভেট সেক্রেটারী, তারপর যথাক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গভর্নর এ, ডি, সি, এস্, পি ও চীফ সেক্রেটারী। মাচায় ওঠার আগে মিঃ ম্যাকফার্সন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তোমার বন্দুক এনেছ?" এনেছি বলাতে তিনি বললেন, "তাহলে পাশের-মাচায় উঠে পড়।" আগেকার যুগ, গভর্নরের শিকারে তাঁর সঙ্গের যারা এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আমার মত সাধারণ হাকিমের শিকারের রীতি ছিল না, কাজেই ইতঃস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম, "সামনে যদি আমার জানোয়ার আসে, আমি কি

মারব ?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো "মারবে বৈকি, নিশ্চয়ই।" দ্বিরুক্তি না করে বন্দুক নিয়ে উঠে পড়লাম মাচায়।

হাঁকোয়া শুরু হয়েছে, বাঘের হাঁকোয়া। নিয়ম যে বাঘের হাঁকোয়াতে বাঘ ছাড়া অন্য জন্তু মারবে না। সকলেই আশান্বিত হয়ে বসে, এই বুঝি তারই মাচার সামনে এলো বাঘ। শীতের প্রথমে ঘন চিলবিলের বন তখন গাঢ় কালচে সবুজ। রাত্রে তুষার পড়েছিল, সকালের উত্তাপে গলে গেছে, কিন্তু ঘাস-পাতায় রয়ে গেছে সিক্ততার আভাস। মাঝে মাঝে শীতের কন্‌কনে হাওয়া জাগিয়ে তুলছে মর্মর ধ্বনি। হাঁকোয়াদের তাড়া খেয়ে প্রথমে দৌড়ে পালাল ক্ষিপ্রগতি যারা, তারা হরিণ ইত্যাদি—তড়বড় করে মাচার কাছে গিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল, হরিণের দল ত্রস্ত শংকিত হয়ে। তৈরি বন্দুক সামনে রেখে বসে আছি। মিঃ ম্যাকফার্সনের মাচার বাঁ-পাশের মাচা থেকে বন্দুক গর্জন করে উঠল। তার অল্প পরেই মিঃ ম্যাক-ফার্সনের মাচার থেকে গুলির শব্দ। তারও কিছু পরে দেখি আমার মাচার সামনে একটি বাঘের বাচ্চা, শিশুত্ব ঘুচে প্রায় যৌবন এসেছে। সাত-আট ফুট লম্বা দেহ। মারবো কি মারবো না ইতঃস্তত করে বন্দুক তুলে গুলি করলাম, বাঘ শুয়ে পড়ল। হাঁকোয়া শেষ হতে মাচা থেকে নেমে মিঃ ম্যাকফার্সনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি মেরেছেন ? তিনি দেখালেন সামনে পড়ে রয়েছে তাঁর শিকার, আমি যে বাঘের বাচ্চাটি মেরেছি তারই জোড়া। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমি গুলি করলাম কিসে এবং মেরেছি কিনা, উত্তর শুনে খুশি হলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখি এস-পি'র মাচার সামনে পড়ে আমাদের মরা বাচ্চাদের মা, বাঘিনীর মৃতদেহ।

স্থির হল মধ্যাহ্নভোজনের পরই কেড়ের কাছের অন্য জঙ্গল 'ঝাঁঝ বয়েরে' আবার বাঘের হাঁকোয়া হবে। তাড়াতাড়ি সে বনে গিয়ে অন্য দল হাঁকোয়া ঠিক করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরেই এলেন সকলে এবং সকলে যখন মাচায় উঠছেন

তখন মিঃ ম্যাকফার্সন আমায় ডেকে বললেন, 'তুমি আসছ না শিকারে?' সকালে তাড়াতাড়িতে আমার বন্দুক ফেলে এসেছিলাম সকালের শিকারের জায়গায়। তাই বললাম যে, 'বন্দুক বোধ হয় ফেলে এসেছি।' কিন্তু দেখলাম আমার ভুল হলেও মিঃ ম্যাক-ফার্সনের দৃষ্টি এড়ায় নি, তিনি ঠিক সঙ্গে করে সেটি এনেছেন এবং আমার হাতে দিয়ে বললেন 'বসে পড় মাচায়।'

হাঁকোয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এ-ডি-সির মাচা থেকে এক গুলির শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেকে বললেন, বাঘ জখম হয়েছে এবং মাচাগুলির পেছন দিকে পালিয়ে গেছে। হাঁকোয়া যে গেল, সকলে নিজের নিজের মাচায় স্তব্ধ হয়ে বসে, আমি মাচা থেকে নেমে গেলাম এবং বললাম, 'এখনই ওকে আমি শেষ করে আসছি।' বন্দুক হাতে নিয়ে রক্ত চিহ্নিত তার পলায়নের পথ অনুসরণ করে চলতে শুরু করেছি, পেছন থেকে কানে এলো 'থামো' পাশে এসে দাঁড়ালেন স্যার এডোয়ার্ড গেট্, বললেন, 'আমি যাব তোমার সঙ্গে, একা বিপদের সম্মুখীন হতে তোমাকে দেব না তো।' বললাম, 'একটু অপেক্ষা করুন, বাঘ মরবেই, গুলি ওর ফুস্‌ফুস্ বিদ্ধ করেছে।'

তিনি প্রশ্ন করলেন, কি করে বুঝলাম। দেখলাম রক্ত যেখানে পড়েছে সেখানে রক্তর মধ্যে রয়েছে বুদ্বুদ যা অন্য কোন জায়গার রক্তে থাকা সম্ভব নয়। এ জঙ্গলটি পাহাড়ের উপর বা গায়ে নয়। প্রায় সমতল জমি। কোথাও বা ধীরে নেমে গেছে, কোথাও বা সামান্য উঁচু। আহত বাঘকে খোঁজবার সময় যেমন বৃক্ষারোহণ তৎপর একটি লোককে গাছে উঠিয়ে দেখে নিই, কাছে-পিঠে বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা! আবার নামাই, এগিয়ে আবার ওঠাই, এবারও তেমনি করেই এগিয়ে চললাম। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটি নালা নেমে গেছে, দেখি রক্তের দাগ। সেই নালার মধ্যে নেমেছে সে। কোথায় যেতে পারে হিসেব করে নালাটিকে বাঁ পাশে রেখে ঈষৎ ঢালু পথে নেমে চললাম। কয়েক বার গাছে চড়ে দেখার পরই লোকটি ইসারায় দেখাল, সে সামনেই শুয়ে। দুজনেই বন্দুক তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম, দেখি সামনেই পড়ে রয়েছে বৃহৎ বাঘের মৃতদেহ।

প্রথম দিনই চারটি বাঘ মেরে সকলে খুবই খুশি। শিকারে গভর্নরের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

আট

বীর কেশরী সিং

চাইবাসা থেকে ছোট ভাই বিনয়ের চিঠি এলো শিকারের আহ্বান নিয়ে। সে লিখেছে 'পত্রপাঠ চলে এসো। আমরা চিরিয়াভুইয়ার জঙ্গলে শিকারের মৎলব করেছি। তুমি, আমি, ইন্দু সরকার, কিশোরী চক্রবর্তী ও বীর কেশরী সিং।' বীর কেশরীর সঙ্গে শিকার এবং দেখাশুনা হবে মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

মনে পড়ে কাকামণির কাছে শোনা বীর কেশরীর পিতার কাহিনী। রেলপথ তখন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিরি-নদী-বন অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলকে সংযুক্ত করেনি, বাষ্পীয় শকটের লৌহপেশী সঞ্চালনে ছোটনাগপুরের বনপথ ওঠেনি কেঁপে। জীবনের গতিবেগ ছিল ধীর মন্থর। তখন গরুরগাড়ি অথবা পাল্কি করে এর দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হত পরদেশীকে। ১৮৮৪-১৮৯২ সালে বি এন আর কোম্পানী আসানসোল, পুরুলিয়া, চক্রধরপুর, মনোহরপুর দিয়ে ছোটনাগপুরের দুর্গম বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে রচনা করে প্রথম রেলপথ। আমার কাকামণি শ্রীকান্তি ভূষণ সেন এই রেলপথের জমি 'অ্যাকয়ার' করেন। সারা অঞ্চল তখন দুর্দান্ত বনের অধিকারে, প্রচুর জন্তু-জানোয়ারের আশ্রয়। সেই সময় এই এলাকায় এক শিকারী জমিদার ছিলেন। নাম অভিরাম সিং তূণ। কথায় বলে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' এই অভিরাম তূণ ছিলেন শিকার এবং বাঘের গতিবিধি, স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী। গ্রামের লোকদের বিশ্বাস ছিল তিনি বাঘ-সিদ্ধ। কেবল যে তাঁর নিজের প্রজারা তাঁর অনুগত ছিল তা নয়, ও এলাকার যাকে যখন তিনি যা বলতেন, সে তখনি তা মেনে নিত বিনা প্রতিবাদে। এর কারণ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বও বটে আবার কতক এই ভয়ে যে, তাঁর বাঘ চালান দেবার ক্ষমতা আছে এই বিশ্বাসে। বাঘ চালান দেওয়া

মানে যে, তার গরু-মোষ বাঘে মারবে। এই রকম একটা বিশ্বাস বা ভীতি গ্রামবাসীদের ভেতর প্রচলিত ছিল।

জনশ্রুতি যে, একবার জেলার পুলিশ সাহেব বাঘ শিকারের বাসনা প্রকাশ করায় সকলে তাকে অভিরামের সহায়তা নিতে পরামর্শ দেয়। অভিরামকে সাহেব ডেকে পাঠালে তিনি অভিবাদন করে দাঁড়াইলেন, সব শুনে প্রশ্ন করলেন, "শিকার কবে করবেন?" সাহেব উত্তর দিলেন, "যে-কোন ছুটির দিন হলেই ভাল হয়, সামনের রবিবার নাগাদ।" আবার প্রশ্ন "কতদূরে শিকার করবেন?" "কাছের কোন জঙ্গলে হলেই সুবিধা হয়।" "আজ্ঞে, পায়ে হেঁটে শিকার করবেন, না মাচায় বসে হাঁকোয়া করে?" সাহেবের আত্মাভিমান জেগে ওঠে, তিনি বলেন, "পায়ে হেঁটেই করব।" "কখন শিকার করবেন?" "সকালের দিকে হলেই সুবিধা হয়, এই ধর ব্রেকফাস্ট খেয়ে।" অভিরাম বললেন. "যে আজ্ঞে, কতো বড় বাঘ?" এবার সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তিনি রুখে ওঠেন, "তুমি কি তামাসা করছ আমার সঙ্গে, বলি বাঘ কি তোমার পোষা নাকি?" জিভ কেটে অভিরাম বলেন, "না-না ও-কি কথা বলেন, সব জেনে নিলাম কারণ সেইমত বন্দোবস্ত করব তো।"

নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ সাহেব অশ্বারোহণে বের হন শিকারের জন্য সজ্জিত হয়ে, বনের প্রান্তে আগেকার নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষমান অভিরামের সঙ্গে মিলিত হন, তারপর দুজনে হেঁটে অগ্রসর হতে থাকেন। "এক ক্রোশের ভেতরই বাঘ পাওয়া যাবে হুজুর।" আশ্বাস দেন অভিরাম। ক্রমশ বেলা বেড়ে ওঠে, হাঁটতে হাঁটতে ঘর্মাক্ত সাহেব জানতে চান, এক ক্রোশ কি এখনও হয়নি? আমাদের জংলী লোকের "ডালভাঙা ক্রোশ, তার মানে চলতে চলতে ডাল ভেঙে নিই, যেখানে গিয়ে তার পাতা মুষড়ে পড়ে, সেখানে হয় এক ক্রোশ আমাদের হিসাবে। তা একটু আগেই পাবেন।" জবাব দেন অভিরাম। গভীর জঙ্গলে কিছুদূর গিয়ে ঝোপের ভেতর একটা মোড়

ঘুরতেই আচমকা সাহেব দেখেন বিরাট বাঘ শুয়ে সামনেই। তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, এত হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন যে, যতবার বন্দুকে গুলি ভরতে যান, হাত থেকে গুলি পড়ে যায়। তাঁর অবস্থা দেখে অভিরাম তাঁর হাত থেকে বন্দুক তুলে বাঘটিকে একটি গুলিতে মেরে আবার তাঁর হাতে বন্দুক দিয়ে বলেন, "সাহেব, বোলো তুমিই মেরেছ।" তাঁর এলাকার বন এবং সেই বনের আনাচ-কানাচ তাঁর নখদর্পণে, গ্রীষ্মের দিনে বাঘ সাধারণত তার 'রাহানে' থাকবে তিনি জানতেন, তাই তাঁর জানা একটি 'রাহানে' নিয়ে গিয়েছিলেন। এ হল প্রচলিত গল্প। এই অভিরাম সিং তূণেরই উপযুক্ত ছেলে বীর কেশরী।

চাকরি জীবনের শেষে ১৯১৪-১৯১৫ সালে কাকামণি আবার কর্ম-জীবনারম্ভের মধুর স্মৃতিময় সিংভূমে বদলি হন স্বেচ্ছায়। সেই সময় তিনি আমায় বীর কেশরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। খর্বাকৃতি কৃষ্ণকায় যুবক, সুদৃঢ় গঠন, তাঁর অন্তরের আত্মপ্রত্যয় যেন প্রতিফলিত তাঁর মুখে। স্বল্পভাষী এবং বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনে বিশেষ বিচারশীল, সহজে তিনি কাউকে বন্ধুত্বের সম্মান দিতে চাইতেন না। তীর-ধনুক এবং বন্দুকে ছিল তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্য। তাঁর তীর-ধনুক দিয়ে মাছ শিকার এবং উড়ন্ত পাখী শিকার এনে দেয় বিস্ময়। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল তাঁর অপরিসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাস। তাঁর শিকারের কৌশল ছিল বিচিত্র ও অভিনব। আগেই বলেছি সিংভূমের এ অঞ্চল গভীর বনে আচ্ছন্ন। বেশির ভাগই সংরক্ষিত বন। এমন বনও আছে যেখানে কখনও কাঠুরিয়ার কুঠার পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। বন যেন এখানে গৌরীর মত কুমারী ব্রত অবলম্বন করে রয়েছে। একদিকে মধ্য-ভারতের জঙ্গল এসে মিশেছে, বহুদূরব্যাপী এই বনের অন্যদিকে গিয়ে এক হয়ে গেছে উড়িষ্যার এবং ছোট ছোট সামন্ত-রাজ্য ময়ূরভঞ্জ, বনাই, কেঁওঝোর ইত্যাদির গভীর বনের সঙ্গে। হাতী, বাইসন, বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, শম্বর এ বনে

যথেষ্ট আছে। সাধারণত জন্তু-জানোয়ার বাঘ ছাড়া অন্য জন্তুকে ভয় পায় না। একে অন্যকে কৌতুকপূর্ণ চমকিত দৃষ্টিতে দূর থেকে দেখে মাত্র, পালাবার প্রয়োজন আছে কিনা বিচার করে, দেখবামাত্র পালায় না। অনেক সময়েই হয়, একদিকে হয়ত বাইসন বা বন্য হস্তীর যূথ চরে বেড়াচ্ছে, তার কিছু দূরেই নিশ্চিন্তমনে হরিণ বা শম্বরেরা তাদের খাদ্যান্বেষণে মন দিয়েছে। বীর কেশরীর নিজের হাতী ছিল, তাকে তিনি নিজেই চালাতেন। অনেক সময় একাই সজ্জিত রাইফ্‌ল ও তীর-ধনুক পাশে রেখে হাতীর পিঠে লম্বা হয়ে শুয়ে হাতীকে জঙ্গলে প্রবেশ করাতেন। নিজেকে হাতীর পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে প্রায় অদৃশ্য করে তার গায়ে হাত দিয়ে ইসারা করে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতেন বনে বনে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কত জন্তু-জানোয়ারই চোখে পড়ত, যারা তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন না থাকায় নিঃশঙ্ক হয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াত। এই স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের মধ্যে ঘুরে ফিরে জন্তু-জানোয়ার দেখা ও অভিজ্ঞতা অর্জনই হল শিকারীর আনন্দ।

বিনয়ের কাছে চাইবাসায় গেলাম। সে ছিল সেখানে ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার সে সময়। শিকারে তার আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত নেই, কাজেই বড় ও হিংস্র জন্তু শিকার করেও প্রচুর। সিংভূমের ঘন সংরক্ষিত বনময় পর্বতগুলিকে অজস্র পাকে বেষ্টন করে চলে গেছে রাজপথ। কখনও পর্বত-শিখর অতিক্রম করে কখনও বা তারই কোল বয়ে। একদিকে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়, আর এক দিকে নেমে গেছে খাদ—ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেছে বন্য গাছপালার মাথায় মাথায়। শিকারের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে চাইবাসা থেকে আমরা চার জন গেলাম মনোহরপুর, যেখানে বীর কেশরীর বাড়ি। এখানে বেঙ্গল আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল কম্পানীর লোহার খনি। লৌহময় প্রস্তরে ছাওয়া পাহাড়ের গায় এখানে লালচে আভা। গভীর বন চারিদিকে, তারই ভেতর দিয়ে অপরিসর রেলপথে স্টিল কম্পানীর ট্রলি খনির গর্ভ থেকে

বহন করে আনে খনিজ লৌহ। আমরা তারই একটিতে করে কিছুদূর গিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম। বীর কেশরী সেখানে লোককে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। বেলা বেশি হলে সাধারণত জন্তু-জানোয়ার নিজেদের অভ্যস্ত বন ছেড়ে আত্মরক্ষা ও বিশ্রামের জন্য গভীর বনে আশ্রয় নেবার আগেই যাতে শিকার হয়, তাই তখনই বেরিয়ে পড়া গেল। সেদিন মাত্র একটি বাইসন শিকার হল। শিকার শেষে একটু বন্দুকের নিশানা অভ্যাস করা হল, তারপর বসা গেল গল্প-সল্পে। সেই সময় বীর কেশরীর একটি খুব হালের অভিজ্ঞতা শুনলাম, যা তাঁর অসীম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। এই বন্য এলাকায় মনুষ্য জাতি খুবই কম। প্রতি বর্গমাইলে এত কম অধিবাসী এক হিমালয় প্রদেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগই আদিবাসী। প্রকৃতি এবং হিংস্র পশুর সঙ্গে সংগ্রাম তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং আজীবন অভ্যাস। প্রায় শৈশব থেকেই তাই তারা ধরতে শেখে তীর-ধনুক, নিশানাও তাদের অব্যর্থ। এ-ছাড়া জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব প্রতিরোধের অন্যান্য আরও অনেক উপায় তারা করে। অনুর্বরা জঙ্গলময় জমির সামান্য ফসল বাঁচাবার জন্য গ্রামের আস-পাশের জঙ্গলের শূয়োর, হরিণ, খরগোস এমন কি পাখী পর্যন্ত মেরে শেষ করে দেয় তারা। খাদ্যান্বেষণে ঘুরে-ফিরে বাঘ যখন এরকম জঙ্গলে আসে, তখন তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে গ্রামের গরু-মোষ বা মানুষের উপর। তা না হলে তাদের উপবাস করতে হয়। হয় নিরীহ আত্মরক্ষায় অক্ষম মনুষকে শিকার সহজ বলে কিম্বা তার রক্ত-মাংসের স্বাদ ভাল লাগে বলে ক্রমে তারা নরখাদক হয়ে দাঁড়ায়।

একবার বীর কেশরীর অঞ্চলে একটি বাঘ এমনি নরখাদক হয়ে দাঁড়ায়। একই গ্রামের একই জায়গায় যে বার বার মানুষ ধরে তা নয়, আজ এ গ্রামে, কাল পাঁচ মাইল দূরে, কদিন পর হয়তো আবার

এ গ্রামেরই অন্যদিকে আরও দূরে। এমনি করে মানুষ মারায় সে অঞ্চলে ভীষণ ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার করে। সরকার থেকে যথারীতি এই নরখাদক বাঘ মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং ক্রমে বাড়তে বাড়তে পুরস্কারের মূল্য এক হাজার টাকা পর্যন্ত ওঠে। বীর কেশরী এই নরখাদক বাঘ মারার সঙ্কল্প করে বাঘের উপদ্রুত অঞ্চলের মাঝামাঝি গ্রামে ডেরা করলেন এবং চারিদিকের প্রজাদের ডেকে বললেন, বাঘে কোথাও মানুষ মারলেই সেখানে প্রহরায় লোক রেখে যেন তাঁকে যতশীঘ্র সম্ভব খবর দেওয়া হয়। একদিন দুপুরের কিছু পরে খবর এল কাছের গ্রামে বাঘে একটি লোক কিছুক্ষণ আগে মেরেছে। শোনামাত্র বীর কেশরী চলে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন পড়ে আছে মৃতদেহ, রক্ত গড়িয়ে পড়েছে তার ঘাড়ের কাছ থেকে। বাঘ কাঁধের উপর এক কামড়ে তার বুক-পিঠের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। ক্ষতস্থানের রক্তটুকু চেটে খেয়ে গেছে। তিনি চারিদিকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে মৃতদেহটি সরিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন এবং মৃতব্যক্তির পরিধেয় কটিবস্ত্রের অনুরূপ একটি আধ-ময়লা কটিবস্ত্র মাত্র পরে যেখানে যেভাবে মৃতদেহটি পড়ে ছিল, সেইভাবে পড়ে রইলেন পাশে গুলিভরা রাইফ্‌ল নিয়ে। সঙ্গের লোকনজন সকলকে দূরে গ্রামে চলে যেতে এবং গুলির শব্দ না শুনলে কাছে কোনমতেই না আসতে আদেশ দেন।

মৃতের আত্মীয়-স্বজন যারা সংবাদ পেয়ে এসে কাঁদছিল, তারা নিয়ে গেল মৃতদেহটি। প্রখর রৌদ্র রুদ্রতেজে যেন অগ্নিবর্ষণ করছে, তারমধ্যে নগ্ন গায়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন বীর কেশরী মৃতের রক্তধারার প্রায় উপরে শুয়ে। সেই রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অজস্র মাছি এসে ঘিরে ধরেছে তাঁকে, মুখে মাথায় সর্বাঙ্গে ক্রমাগত বসছে, পিঁপড়েরা সারিবদ্ধভাবে—আগামী বর্ষার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যস্ত। তারাও তাদের পথের উপর পড়ে থাকতে দেখে কামড়াতে শুরু করেছে,

কিন্তু একচুল নড়ার উপায় নেই, তিনি যে তখন মৃত, নিঃশ্বাস পর্যন্ত জোরে নেবার উপায় নেই। দূর থেকে বাঘ যদি তাঁকে দেখতে পায় এবং সন্দেহ হয় তাহলে তো সবই পণ্ড। মনের ভেতরও চলেছে চিন্তার বিরামহীন প্রবাহ। হয় নিজে মৃত্যুবরণ করবেন, নয় মৃত্যু হানবেন এজন্য তো প্রস্তুত হয়েই এসেছেন, তবুও নানা চিন্তা আসে মনে, বাঘ কোন্ পথে আসবে, কি রকম অবস্থা হলে কিভাবে সম্মুখীন হবেন। রাইফেলে গুলি তো ভরেছেন? সেটা ঠিক আছে তো? শেষ মুহূর্তে সেটা খারাপ বেরিয়ে প্রতারণা করবে না তো? গ্রীষ্মের তপ্ত হাওয়া মাঝে মাঝে হু হু করে বয়ে যায়। অধীর অপেক্ষায় সময়ের গতি যেন মন্থর হয়ে গেছে। ক্রমে অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে এল। প্রতি মুহূর্তে বাঘের আগমন ও শব্দ মনে করে, সমস্ত চেতনা ও সর্বশক্তি সজাগ করে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। কিসের ক্ষীণ শব্দ হল মচ্, গাছ থেকে শুকনো ডাল ভেঙে পড়ল, না বাঘের পায়ের চাপে ভাঙল? না, বাঘের ভারি শরীর বহন করে তার লঘু পদেরই ধ্বনি। বাঘ সত্যিই আসছে, কিন্তু এখনও দূরে। তাদের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বাঘ দূর থেকেই চারিদিক ঘুরে দেখে নেয় মরা আছে কিনা, সন্দেহের কোনও কারণ আছে কিনা? তারপর ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে আসে কাছে, আরও কাছে। আরও একটু কাছে আসুক। নিকট থেকে নিকটতর হয় পদশব্দ। আরও কাছে আরও একটু। যখন বাঘ মাত্র আট-দশ হাত দূরে, তখন বাঘের দিকে মুখ করে ঝট্ করে বন্দুক হাতে উঠে বসলেন বীর কেশরী। নিশ্চিন্ত অসতর্ক বাঘ এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল, তাঁর নিজের ভাষায় 'লাজায় গিয়া'। মুখ অর্ধেক খোলা। মুখের চারপাশে কালো দাঁতগুলি বেরিয়ে আছে, জিভও একটু বের করা, চোখে হিংস্র দৃষ্টি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পলমাত্র, সেই পলমাত্র সময়েই তাঁর রাইফেলের একটি গুলি বাঘের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিল।

ঘটনাটি শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি চারিদিকে শুকনো পাতা ছড়িয়ে রেখেছিলেন কি? তিনি জবাব দেন, হ্যাঁ। চারিপাশে জঙ্গলের শুকনো ঝরা পাতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে অতি লঘু-গতির ক্ষীণতম শব্দও শ্রুতিগোচর হয়। তাছাড়া ধরিত্রী মাতাও শব্দের উত্তম পরিবাহক। যে-সব ক্ষীণ পদশব্দ শ্রুতি-সীমার বাইরে, তাও শোনা যায় অনেক সময়ই পৃথিবীর বুকে কান লাগিয়ে। তাই বীর কেশরী তাঁর সমস্ত চেতনা জাগ্রত করে মাটিতে শ্রবণ সংযোগ করে নিশ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন সেই কালান্তক নরখাদকের। বনের নিস্তব্ধতা ভেদ করে যখনই কানে এল ভারি ওজনের চলার ক্ষীণ শব্দ এবং পরে শুকনো পাতার শব্দ, তখনই বাঘ আসছে জেনে শব্দের গতি লক্ষ্য করেই বুঝলেন কোন্‌দিক থেকে কত কাছে সে এসে পৌঁছেচে। যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও গুলিতে মৃত্যু অনিবার্য, তখনই উঠে বসলেন তার সঙ্গে মুখোমুখি হতে।

বহুদিন তাঁর আর কোনও সংবাদ জানি না, জানি না তিনি আজ কোথায়। আজ হয়তো তিনি জরাগ্রস্ত স্থবির, কিন্তু আমার কল্পনায় তাঁর স্মৃতি চির-নবীনের অপরিমেয় আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত চিরযুবকের চিত্র উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নয়

প্রসাদ

যতক্ষণ কোনও জিনিসকে আমাদের নিজেদের বুদ্ধি এবং জ্ঞানালোক দিয়ে না দেখি ততক্ষণ সেই অজানার প্রতি সাধারণত থেকে যায় একটা সন্দেহ, একটা ভীতি। সাপ সম্বন্ধে আমাদের ভীতিও কতকটা সেই রকম, ওটা আমাদের যেন সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। ভয় করবার কিছু নেই সেকথা বলি না, তবে সাপ শুনলেই যে অনেকের আতঙ্ক হয় সেই কথাই বলছি।

১৯১০ সাল। চাকরি জীবনের আরম্ভে সে সময়টায় রাঁচিতে আমার কর্মস্থল। থেতলে বর্ষায় সব রাস্তা অগম্য হয়ে ওঠার আগেই কতগুলো কাজ শেষ করব বলে রাঁচি জেলার বুড়মুতে গেছি কাজে। শিকারী জীবনেরও সেটা শিক্ষানবীশী অধ্যায়, সবে নতুন বন্দুক এসেছে। বড় বাঘ না মারলেও, তখন বড় বাঘ শিকারের স্বপ্নেই মগ্ন। গ্রামবাসীরা বলল, আস-পাশের জঙ্গলে হরিণ আছে প্রচুর, শিকারে যাব কি না। রাজি হয়ে গেলাম। প্রথম বর্ষার ছোঁয়াচ, বনে লেগেছে সবুজের আভাস। যেখানে গিয়ে বসলাম তার অদূরেই একটি নদী সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে দক্ষিণ থেকে বামে, তার অস্পষ্ট কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে গাদা বন্দুক নিয়ে দুজন স্থানীয় শিকারী আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁরা আলাদা-আলাদা বসেছেন, মাটিতেই আমাদের আসন। কিছুক্ষণ বসার পরই মশার উৎপাতে অস্থির হয়ে উঠলাম। শিকারের প্রাথমিক নিয়ম স্থির থাকবার, তা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠায়, শিস্ দিয়ে কাছের একজন শিকারীকে ডাকলাম। কাছে এসে সে ব্যাপার শুনে সামনের শাল গাছ থেকে কতকগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বেশ করে হাতে কচ্‌লে আমার সারা

হাতে-মুখে-ঘাড়ে তার রস লাগিয়ে দিল। অনেকটা 'রাধুনী'র মত গন্ধ সেই পাতার। তাতে ফল হল, মশারা এসে ভন্ ভন্ করে উড়ে বেড়ালেও গায়ে বসা বন্ধ করল। হাঁকোয়ারা অনেকখানি জঙ্গল ঘিরে নিয়ে হাঁকোয়া করছিল, তাতে বেশি জানোয়ার আসবে এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে, কিন্তু তাতে তারা হরিণ দেখলেও, সে হরিণ আমাদের সামনে আর অসেনি। যাই হোক, দেড় ঘণ্টা পরে, লম্বা হাঁকোয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাছেই শুনি কয়েকজন মিলে লাঠি দিয়ে কি যেন আঘাত করছে। কোনও জন্তু তাড়িয়ে আনছে প্রথমে মনে ভাবলাম, কিন্তু তারপর চুপ-চাপ দেখে হাঁকোয়ার শেষে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার। একজন জবাব দিল—"উ একঠো সাঁপ হৈ"। "সাপ? কি সাপরে?" "উ এগো গহুমন" আর্থাৎ গোখরো, যেন কিছুই না। বলল, মেরে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। বললাম, "করেছিস কি, সাপ কখনও জলে ফেলে? উঠিয়ে আন শীগগির।" উঠিয়ে আনলে দেখলাম একটা বড় গোখরা সাপ। তার মাথাটা থেঁতো করে ফেলে দিলাম।

শিকারে আর মন বসল না, গাদা বন্দুকধারীদের শিকার করতে দিয়ে ফিরে চললাম। আমি আগে আগে, পিছনে কজন হাঁকোয়া। তাদেরই একজনের হাতে আমার বন্দুক। হঠাৎ স্-স্-স্-স্ শব্দে চেয়ে দেখি ফুট সাতেক লম্বা এক গোখরো সাপ আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের ঝরা পাতা গ্রামবাসীরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সেই আগুনের হলকায় মুষড়ে ঝরে পড়া পাতার উপর দিয়ে চলেছে। পেছনের লোকটির হাত থেকে চট্ করে বন্দুক নিয়ে গুলি করলাম। করতেই সে শরীরের সব ভার ল্যাজের দিকে দিয়ে উঁচু হয়ে মস্ত ফণা মেলে দিয়ে বৃত্তাকারে শোঁ করে ঘুরে গেল ফোঁস করে এক ছোবল দিয়ে। মাত্র চার-পাঁচ ইঞ্চির জন্য আমার নাগাল পেল না। ছররাতে তার ল্যাজের দিকের খানিকটা ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ায় তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছিল, আমার উপর প্রতিশোধ নিতে তাই

তার এই ব্যর্থতা। তারপর চক্ষের নিমেষে বিদ্যুৎগতিতে আমার ফুট চারেক দূরে একটা পাৎলা শাল গাছের গুঁড়িতে শট করে জড়িয়ে গেল। দ্বিতীয়বার বন্দুক তুলে আমার দো-নলা বন্দুকের দ্বিতীয় নলটি খালি করলাম। তখনকার দিনের 'ব্ল্যাক পাউডার কার্টরিজ'। তার ধোঁয়া পরিষ্কার হতেই দেখি সাপ আর সে-গাছে নেই। কাছে গিয়ে দেখলাম রক্ত লেগে আছে। বুঝলাম গুলি লেগেছে কিন্তু সে গেল কোথায়? আসে-পাশে খুঁজতে খুঁজতে দেখি সেই শাল গাছের কাছে একটা উঁইয়ের ঢিপি। বর্ষার জলে তার একটা দিক গলে গেছে, তার এদিক-ওদিক খুঁজছি, এমন সময় 'কোঁ-ও-ও' করে ফণা তুলে গর্ত থেকে হাতখানেক মাথা বের করল সে। বুঝলাম গুলি তার শরীরের মাঝামাঝি লেগেছে। তাতে হাড় ভেঙে থেঁতলে গেছে, কিন্তু ল্যাজের দিকটা কেটে আলাদা হয়ে খসে যায়নি, তাই সবটা টেনে নিয়ে চলা তার কঠিন হয়ে পড়েছে! কাছের একটা নতুন সরু শালগাছ কাটিয়ে তাই দিয়ে উঁইয়ের ঢিপি ভেঙে তার ভেতর থেকে টেনে বের করলাম। আঘাত প্রতিহিংসা ও রোষে তখন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে—সামনে গর্জন করছে ফোঁস ফোঁস আর নিষ্ফল ছোবল দিয়ে চলেছে সেই কাটা শালগাছটির উপর। একটা লাঠি দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে বললাম, আন মাহুলানের লতা। আনলে তাই দিয়ে ফাঁসি লাগিয়ে তাকে বেঁধে তার ল্যাজের ক্ষত অর্ধেক কেটে বাদ দিয়ে একটা নবোদ্গম শাল গাছের লম্বা টুকরোর মাঝে তাকে বেঁধে নিয়ে চললাম। প্রাণ বড় শক্ত, সহজে যেতে চায় না। নিচের অতখানি কেটে বাদ গেছে তাও অনেকক্ষণ বেঁচে রইল। তারপর যখন তাকে বুড়মু ইনস্পেকশান বাংলাতে নিয়ে এলাম, তখন সে মরে গেছে। তার মুখটা হাঁ করিয়ে দেখলাম দুপাশে সরু দুটি দাঁত দুটি বিষের থলির ওপর। দাঁতের ভেতর খুব সূক্ষ্ম ছেঁদা। রাগ করে ওরা বিষের থলির পেশীতে চাপ দিলেই ভেতরের বিষ ইন্‌জেকশানের ছুঁচের মত দাঁত দুটির ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে আসে।

দুজনে আপন আপন পথে চলেছিলাম, কোন বিরোধ ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হল একজনকে পরপারে যেতেই হত। এ যাত্রায় সেই গেল। বাংলোর কাছেই একটি কাচ্‌নার (কাঞ্চন) গাছ ছিল। তার ছায়ায় গহুমনের আধখানা দেহ সমাহিত করে একটি পাথর খাড়া করে দিলাম তার ওপর। ঘটনাটি ভুলতে পারিনি, তাই ১৯১৪ এবং ১৯২৮ সালেও যখন কাজে বুড়মুতে গেছি, দেখেছি সেই পাথরটি তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর অনেক সাপের সংস্পর্শে এসেছি। মন্থর গতি অজগর থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রবোড়া পর্যন্ত, বহু সাপ মেরেছিও। অবশেষে ১৯৩১ সালে একবার পরেশনাথের কাছে আমার এক বন্ধু থাকতেন, নাম প্রমথনাথ দাশগুপ্ত, তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে, সুহৃদ বিশ্বপতি গুপ্ত ও ভাগ্নে শচীকে নিয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়লাম তাকে দেখতে। প্রমথর সঙ্গে দেখা করে মেঘচুম্বী পরেশনাথ পাহাড়কে পেছনে রেখে ফিরে চলেছি হাজারিবাগ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। দুপাশে উন্মুক্ত প্রান্তর। তার মধ্যে এক জায়গায় দেখি রাস্তার পাশে কতগুলি লোক মাঠের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। তাদের পাশ দিয়ে পার হয়ে যেতেই শচী ও বিশ্বপতি বলে উঠল, "বাঃ, সুন্দর সাপ তো, ফণা ধরে রয়েছে।" "কই রে?" ওদের কথা শুনে তখনই গাড়ি পেছিয়ে নিয়ে গেলাম। পথের ধারে রাস্তা মেরামতের জন্য মাটি কাটার একটি গর্ত মতন, সেখানে একটি কাল কেউটে সাপ চার ফুট আন্দাজ লম্বা, মাথা তুলে ফণা বিস্তার করে রয়েছে আর দূরে দাঁড়িয়ে কাছাকাছি গ্রামের পথচারীরা তাই দেখছে।

এর কিছুদিন আগে মিহিজামের শ্রদ্ধেয় ডাঃ পি ব্যানার্জির একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম কাগজে, যে, সাপের সংস্কৃত নাম 'চক্ষুশ্রবা', ওরা চোখ দিয়ে শোনে। যখন দেখে তখন শোনে না, যখন শোনে তখন দেখে না। পড়ে পর্যন্ত মনে খুব একটা আগ্রহ ছিল এটা পরীক্ষা করে দেখবার। জন্তু-জানোয়ার পশু পাখী সব রকমই পুষেছি প্রায়,

কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি তাদের বৈশিষ্ট্য। দেখেছি নেকড়ে এবং জংলি কুকুর বা 'কোইয়া' কখনও পোষ মানে না, চিতাকে কোন সময়েই বিশ্বাস করা চলে না এবং বাঘের রাজকীয় খেয়ালী স্বভাব। ওয়ালফোর্ডের শ্রীমণি মেহতা একবার বলেন, তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা আমার পোষা বাঘের বাচ্চা নিয়ে ছবি তোলেন। নির্দিষ্ট সময় তিনি যখন প্রস্তুত হয়ে এলেন, তাঁর চক্চকে নীল রেশমের শাড়ি দেখে বাঘের কি যে ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, কিছুতেই ছবি

তুলতে দিল না, পরে তিনিই যখন অন্য শাড়ি পরে এলেন, সেই বাঘই অতি শান্ত হয়ে ছবি তুলল।

স্থির করলাম সাপটিকে ধরব এবং পুষব। বিশ্বপতিকে বললাম, আমি সংকেত করলেই যেন গাড়ির ইলেকট্রিক হর্ন টিপে দেয় ওদের তো মহা আপত্তি যে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে গিয়ে প্রাণ না হারাই। যাইহোক, গাড়ি থেকে নেমে যে লোকগুলি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কাছ থেকে খানিকটা পাতলা সুতোর দড়ি নিয়ে তাতে একটা ফাঁস দিলাম, কারণ ভেবে দেখলাম শুধু হাত দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরতে গিয়ে একটু নিচে ধরলেই সে ছোবল মারবে কিন্তু দড়ির ফাঁসি লাগিয়ে সুতোর দুপাশ ধরলে সহজে ছোবলাতে পারবে না।

বিশ্বপতিকে সংকেত করতেই সে ইলেকট্রিক হর্নটিকে টিপে দিল। নতুন অবার্ন-গাড়ির জোর হর্নের শব্দে সাপটা যেদিক থেকে শব্দ আসছে সেই দিকে মাথা ঘোরাল। কৌতূহলী পথচারীদের দিক দিয়ে সাপ যেদিক মুখ করে আছে তার উল্টো দিক দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার গলায় ফাঁসি দিয়েই পা দিয়ে তার ল্যাজ চেপে ধরলাম। সাপ তখন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল আমাকে ল্যাজ দিয়ে জড়াতে কিন্তু তার সে উপায়ও নেই। শচীকে বললাম, "একটা মাটির হাঁড়ি ঢাকনাশুদ্ধ জোগাড় করতে পারিস ?" কিন্তু কাছাকাছি কোন মনুষ্যবসতি নেই। গ্রাম সেই মাইলখানেক দূরে। বললাম, যা সেখান থেকে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ দুপাশের সুতো আঙুলে জড়িয়ে খাটো করে এনে তার গলা হাত দিয়ে চেপে ধরেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁড়ি ও ঢাকনা নিয়ে এল শচী। হাঁড়ির মুখটা খুলে তার কাছে সাপের মাথাটা নিয়ে একটু আলগা দিতেই সে সুড় সুড় করে তার মধ্যে ঢুকে গেল। তখনি তাকে সরা চাপা দিয়ে হাঁড়ির মুখে রুমাল বেঁধে মোটরে করে বাড়ি নিয়ে এলাম।

আমার বড় দিদি এবং ভগ্নিপতি তখন আমার কাছে এসেছেন। বাড়ির সকলে সন্ধ্যা বেলায় একসঙ্গে বসে গল্প করছেন। এমন সময়

বাড়ি ঢুকলাম হাঁড়ি হাতে। ডেকে বললাম, "তোমাদের জন্য প্রসাদ এনেছি, কি প্রসাদ যদি বলতে পর দশ টাকা দেব"। প্রসাদ শুনেই সকলে ভক্তিভরে হাঁড়িতে মাথা ঠেকালেন, তারপর অনুমানের পালা। কেউ বলে হালুয়া, কেউ বাতাসা, মায় পাঁঠার মাথা পর্যন্ত। তখন বললাম, "তোমরা কেউ পারলে না, সাক্ষাৎ মা মনসা—একটি কাল কেউটে।" যাঁহা বলা সব চেঁচামিচি শুরু হয়ে গেল। বাড়ির দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির সামনের দালানের মেঝেটায় খুব পালিশ। বাড়ির সকলকে গ্যালারির মত সিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে সেই দালানে যেই হাঁড়ির মুখ খোলা, ফোঁ-ও-ও-স্ করে সাপ হাঁড়ি থেকে ফণা তুলে বেরিয়ে এল কিন্তু পালিস মেঝেয় তার তাড়াতাড়ি চলার ক্ষমতা নেই। তীব্র প্রতিহিংসার রোষে তখন সে ফুলছে। তার সামনে কাপড় নাড়াতে ফোঁস করে এক ছোবল মারল। আমি সাঁৎ করে সরে গেলাম, মাটির উপর ছিটকে পড়ল খানিকটা পীতাভ তরল পদার্থ—তার অস্ত্র, বিষ। সকলের সমবেত চিৎকার উঠল, "মারো, ওকে মেরে ফেলো শীগ্‌গির।" স্ত্রীর অজস্র বকুনী, বড়বোনের দিব্যি, ভগ্নিপতির অভিমান একসঙ্গে সব-কিছুর তাড়ায় শেষ পর্যন্ত আমার সব আপত্তি অনুরোধ ব্যর্থ করে ভগ্নিপতি তার সর্প জীবন থেকে তাকে মুক্তি দিলেন। অতএব সাপ পোষবার সাধ মনেই রয়ে গেল, পোষা আর হল না।

দশ

গোকুল সিং

আকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়ল গোকুল সিংয়ের স্ত্রী আমাকে দেখে—"কোথায় ছিলি তুই এতদিন, আমার স্বামী তোর এত-দিনের পুরনো শিকারী, লাটসাহেবের এত শিকারে এতদিন সে ঘুরল তোর সঙ্গে, কোনদিন কিছু হল না, আজ তুই থাকতে তার অপমৃত্যু হল, তাও হাসপাতালে আমাদের সকলের থেকে দূরে। বাঘ আমাদের প্রতিবেশী , কোনদিন কিছু হল না, শেষে সেই বাঘের হাতে তাকে মারলি।" পিতৃহারা শিশুরাও কাঁদতে লাগল তাদের মায়ের সঙ্গে। পালামৌর দুর্ভেদ্য বনের মাঝে কেড়ের ক্ষুদ্র গ্রামপ্রান্তে গোকুলের কুটির প্রাঙ্গণে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম, সান্ত্বনার সব ভাষাই অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে এল। চোখের সামনে ভাসতে লাগল গোকুলের দৃঢ় নির্ভীক চেহারা। আমার একান্ত অনুগত শিকারী কতদিনের কত বিপন্ন অবস্থার সাথী। যে চলে গেছে তাকে তো ফিরিয়ে আনা যাবে না, তবুও যারা রইল তাদের বাঁচাতে হবে। জীবনের পথ বড়ই দুর্গম। চলার পথে প্রিয় সাথী, প্রাণাধিক সন্তান, যারা একান্ত আপন, যাদের ছাড়া জীবনই অর্থহীন, কত সময় তারা যায় হারিয়ে মৃত্যুর আঁধারে। তবুও এগিয়ে যেতে হবে, চলতে হবে শেষ পর্যন্ত। গোকুলের স্ত্রীর কান্না শুনে গ্রাম-বাসীরা একে একে এসে সমবেত হল, তারাও অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। নানারকম সান্ত্বনা তারা দিতে লাগল গোকুলের বিধবাকে এবং প্রতিশ্রুতি দিল ক্ষেত জোত করে ফসল উৎপাদন করে দেবে। সরকারের পক্ষ থেকে গোকুলের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু জমিজমা এবং শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্য অর্থ দেবার ব্যবস্থা করতে এবং তাদের গভীর দুঃখে-শোকে সমবেদনা জানাতে

পাঠিয়েছিলেন আমাকে মিঃ বার্থুড, ছোটনাগপুর ডিভিশানের কমিশনার। আর্ত রমণীর করুণ ক্রন্দনে আমার নিজের অশ্রুও সংবরণ করতে পারিনি, বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম সেই কুটীরপ্রাঙ্গণে গোকুলের ছেলেকে কোলে নিয়ে। গোকুলের একমাত্র সন্তান—বছর দশেক তখন তার বয়স। সাধ্যমত সান্ত্বনা দিয়ে আমার কাজ শেষ করে, ডালটনগঞ্জ ও রাঁচি হয়ে হাজারিবাগে ফিরে এলাম। কতদিন পর্যন্ত ভুলতে পারলাম না গোকুলকে এবং শিকারের অমার্জনীয় নানারকম রীতিবিরুদ্ধভাবে তার সাংঘাতিক মৃত্যু।

কয়েক বছর ধরে পালামৌ খাসমহল ও তৎসংলগ্ন কতগুলি সংরক্ষিত জঙ্গলে গভর্নরের শিকারের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলাম। প্রতি বছরই বড়দিনের সময় বিহার ও উড়িষ্যার গভর্নর ও তাঁর নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতেন শিকারে। পালামৌ, রাঁচি ও হাজারিবাগ তিন জেলা নিয়ে তখন আমার কর্মস্থল। শিকার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার ছিল আমার উপর এবং সব বন্দোবস্ত খাসমহলের প্রজাদের উপর। প্রকৃত শিকারী তারাই, তারাই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে জন্তু-জানোয়ার হাঁকোয়া করে নিয়ে আসত বন্দুকের সামনে। গোকুল সিং ছিল কেড় জঙ্গলের এই সব শিকারীদের নেতা। জন্তু জানোয়ারের চাল-চলন রীতিনীতি এসবে ছিল সে বিশেষ অভিজ্ঞ। কেড়ের বনের প্রতি কোণা-ঘুঁচি জন্তু-জানোয়ারের ও বড় বন্য পাখীর আবাস তার নখদর্পণে এবং পদচিহ্ন দেখে অনুসরণ করায় বিশেষ পারদর্শী। শিউধারী এবং গোকুল এরাই কেড়ের শিকারের অপরিহার্য অঙ্গ, গ্রামবাসীদেরও প্রগাঢ় আস্থা ও নির্ভর।

সাধারণ নিয়ম ছিল গভর্নরের নিমন্ত্রিত অতিথি ব্যতীত অন্য কেউ এই জঙ্গলে শিকার করলে তার অনুমতি নিতে হত গভর্নরের। সে বছর বড়দিনে অন্য কাজে আবদ্ধ থাকার জন্য গভর্নরের শিকার

বন্ধ রইল, সেই অবসরে তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন মাননীয় মেম্বর শিকারের অনুমতি নিলেন। তাঁর শিকারের সব বন্দোবস্ত করা যখন আমার শেষ হয়ে গেছে তখন আমার ওপরওয়ালা বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ছুটিটা বাড়িতে কাটাতে চান, তা আপনি যান না, কদিন ছুটি উপভোগ করে আসুন।" বুঝলাম আমি অবাঞ্ছিত ; কাজেই আমিও তখনই সরে এলাম শিকারের ক্ষেত্র থেকে সোজা হাজারিবাগে।

১লা জানুয়ারী। সকালেই কমিশনার রাঁচি থেকে আমার হাজারিবাগের বাড়িতে ফোনে ডেকে বললেন, "বিজয় তুমি একবার এখনই আসতে পার ? বিশেষ প্রয়োজন।" জবাব দিলাম, "দু ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছব।"

বেলা ৯টায় রাঁচিতে কমিশনার মিঃ বার্থুডের বাড়ি আমি যেতেই তিনি আমায় বললেন—"একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বিজয়। মাননীয় মেম্বরের শিকারে তুমি এবার কেন সরে এলে বলতো ?" তাঁকে বললাম কারণ। দুর্ঘটনার কথায় তিনি বললেন, "মাননীয় মেম্বর ৩০শে বিকেলে শিকারে যান। কেড়ের জঙ্গলে বাঘের হাঁকোয়ায় বড় বাঘকে তিনি গুলি করেন তাতে বাঘ আহত হয়। তাঁকে খুঁজে বার করতে গিয়ে একজন শিকারী ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। কাল গভীর রাতে ডেপুটি কমিশনার এক বিশেষ পত্রবাহক মারফৎ মোটরে করে ডালটনগঞ্জ থেকে এই খবর পাঠিয়েছেন।" চিঠিখানা তিনি আমাকে দেখালেন, তাতে আমার শিকারী গোকুলের নাম দেখে বড়ই মর্মাহত হলাম। এই সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের হতে লাগল, এমন সময় একখানি মোটর গাড়ি বাইরে আসার শব্দ পেলাম এবং একটু পরেই চাপরাসী চিঠি এনে দিল। পড়ে শুষ্ক মুখে মিঃ বার্থুড বললেন, "সে মারা গেছে এই খবর এল। দেখ, আমি চাইনা যে গ্রামবাসীদের ভেতর এমন একটা কথা হয় যে, "সাহেবরা করে

শিকার, আর গরীব আমাদের যায় প্রাণ। সে বড়ই বিশ্রী ব্যাপার। তোমার উপর গ্রামবাসীদের অগাধ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা, তুমি এর উপযুক্ত ব্যবস্থা কর যাতে সব ঠাণ্ডা হয় এবং অশোভন না হয় সব ব্যাপারটা।" আমি তখনই পালামৌ রওনা হয়ে গেলাম।

গোকুলের মৃত্যু সম্বন্ধে এইটুকুই জানতাম। বিস্তারিত বিবরণ শুনলাম তার গ্রামের আমার অন্যান্য শিকারীদের কাছে যারা নিজেরা উপস্থিত ছিল সে ক্ষেত্রে। ঘটনাটি এই ঃ—

কেড়ের জঙ্গলে শিকার হচ্ছে। ঘন শালের দুর্ভেদ্য বন, দিবালোকের পথ রোধ করে আছে। আধ-আলোছায়াতে বেড়ে উঠেছে ঘাসরা, কোথাও কোথাও হাতী পর্যন্ত ডুবে যায় এত লম্বা। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড় যেন প্রকৃতির অন্তরের শ্যামলিমা ফোয়ারা হয়ে উৎসারিত হয়েছে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামের মাঝে কোথাও কোথাও এমনি চার-পাঁচ মাইলব্যাপী জঙ্গল। বাঘ, ভালুক, বাইসন, শম্বর, চিতা, হরিণ, ময়ুর, মুর্গী সকলেরই আশ্রয় এই বন। ভক্ষ্য এবং ভক্ষক উভয়েই এখানে বেড়ে উঠেছে। মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে এরা সংখ্যা বৃদ্ধিও করে চলেছে।

কেড় থেকে বার মাইল দূরে শিকার ক্যাম্প। কেড় জঙ্গলে বাঘে মোষ মেরেছে, সকালে এই দেখে এ খবর শিকারীরা গিয়ে লাটের ক্যাম্পে দিল। সংবাদ পেয়ে সাজসজ্জা করে প্রস্তুত হয়ে শিকারীরা এসে যখন মাচায় বসলেন তখন বেলা দ্বিপ্রহর। জঙ্গল খুব ঘন, একটু দূরের বেশি চোখে দেখা যায় না। উপরের থেকে যাতে দৃষ্টিসীমার পরিধি একটু পরিসরতর হয় এই জন্যই মাচা বাঁধা। গাছ অবলম্বন করে আট-দশ ফুট উঁচুতে মাচা বাঁধা হয় বাঘের স্বাভাবিক গতিপথের উপর। হাঁকোয়া শুরু হল। হাঁকোয়ারা যথারীতি ধীর পদক্ষেপে জন্তু তাড়িয়ে নিয়ে আসতে লাগল, যাতে তাড়া খেয়ে তারা তাদের স্বাভাবিক গতায়াতের পথেই যায়। বেশি তাড়া দিলে সেপথ ত্যাগ করে যেদিক সেদিক দিয়ে চলে যাবে মাচার

সামনে আর আসবে না। সেদিনও বাঘ তাড়া খেয়ে সম্ভাবিত পথে সম্মানিত অতিথির মাচার সামনেই এল এবং তিনি বাঘের ঘাড় লক্ষ্য করে গুলি করলেন। গুলি লাগল, কিন্তু বাঘ মরল না, ভীষণ গর্জনে বনের হৃদয় স্পন্দিত করে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাঁকোয়ারা গুলির শব্দও শুনল, বাঘের গর্জনও শুনল, বুঝল বাঘ আহত। মাচা থেকেও সেই সংবাদই জানিয়ে দেওয়া হল। তখন তারা হাঁকোয়ার নিয়ম অনুসারে যে যেখানে আছে দাঁড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করতে লাগল যাতে বাঘ আবার ফিরে যায়, কিন্তু বাঘ না গেল ফিরে, না হাঁকোয়াদের শ্রেণী পার হয়ে পালাল। চারিদিকে নেমে এল নিস্তব্ধতা। আহত বাঘ যে কোথায় মাটি নিয়ে আছে তাও দৃষ্টিগোচর হয় না। মাচার শিকারীরা কেউ নেমে বাঘকে খুঁজে মারতে গেল না, নিরস্ত্র লাঠি মাত্র সম্বল হাঁকোয়ারাও ভরসা পেল না সাক্ষাৎ কালান্তক বাঘের খোঁজ করতে। এদিকে শীতের স্বল্পায়ু দিন শেষ হয়ে এল। তখন মাননীয় অতিথি এবং ডেপুটি কমিশনার আলোচনা করে স্থির করলেন যে, গুলি যখন লেগেছে, পাঁচশো বোর রাইফেলের গুলি, বাঘ তখন মরবেই। রাতের মধ্যে একান্ত যদি নাই মরে, পরের দিন সে একটু নিস্তেজ হয়ে এলে তখন খুঁজে বের করা সহজ হবে। সেই অনুসারেই নির্দেশ দেওয়া হল হাঁকোয়াদের। কিন্তু পরের দিনই মাননীয় মেম্বরকে ফিরে যেতেই হল, তাই ডেপুটি কমিশনারকে বলে গেলেন বাঘকে মৃত যদি পাওয়া যায় চামড়াটা তাঁকে পাঠিয়ে দিতে।

পরদিন হাঁকোয়াদের নির্দেশ দেওয়া হল, আহত বাঘকে খুঁজে বার কর। তারা মোষ নিয়ে এগিয়ে চলল খুব সাবধানে। কিছুক্ষণ খোঁজবার পরই মোষের সাড়া পেয়ে সগর্জনে বাঘ জ্ঞাপন করল তার অস্তিত্ব—কেবলমাত্র অস্তিত্ব নয়, তার তেজ এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তাও বোঝা গেল তার কণ্ঠস্বরের প্রাবল্যে। মোষেরা এদিক-ওদিক পালিয়ে যেতে চাইল, কিছুতেই তাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে

রাখা গেল না। ভীত হয়ে হাঁকোয়ারা তখনই সংবাদ দিল ডেপুটি কমিশনারকে। তিনি তখন মাচায় এসে বসলেন এবং হুকুম দিলেন বাঘকে তাড়িয়ে আমার সামনে আনো। আহত বাঘকে তাড়িয়ে আনা সে যে কতদূর অসাধ্য এবং কী ভয়াবহ তা তিনি চিন্তা করলেন না। সকলে ভীত হয়ে এ ওর মুখ চাইতে লাগল। গোকুল সিং ছিল ধীর স্থির এবং সে যে কাজে একবার হাত দিত তার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিরত হত না। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল সে, যেখান থেকে বাঘের গর্জন শেষ শোনা গেছিল সেইদিক লক্ষ্য করে। ইত্যবসরে বাঘ যেখানে ছিল সেখান থেকে উঠে দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে এসে এক ঝোপের পাশে কখন যে লুকিয়ে বসেছে তা কেউ জানতেও পারেনি। যেখান থেকে সে গর্জন করেছিল সে জায়গা এখনও দূরে এই বিশ্বাসেই গোকুল চলেছিল। সেই সুযোগ বুঝে বাঘ পাশের ঝোপ থেকে অতর্কিতে সহসা সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোকুলের উপর এবং একটি কামড়েই তার জংঘার হাড় গুঁড়া করে দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলল এবং তার উপর চেপে বসল। এই অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় চারিদিকে পড়ে গেল সন্ত্রাসের সাড়া। গোকুলের সঙ্গী সাথী কাছে পিঠে যারা ছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছত্রভঙ্গ হয়ে সকলেই ছুটল, কেউ বা মাচার দিকে সংবাদ দিতে, কেউ বা প্রাণ নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে। মাচার শিকারী এবং হাঁকোয়ারা সব যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল কি করা উচিত, কি করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারল না। প্রতিহিংসার যে ভয়ঙ্কর রূপ তারা দেখেছে তাতে বাঘের সম্মুখীন হবার মত সাহস কারুরই হল না। গোকুল কি আর বেঁচে আছে এতক্ষণ, তার কাছে যাওয়া মানেই তো স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা, অথচ এমনি-ভাবে গোকুলকে তাদের সামনে থেকে বাঘ নিয়ে গেল। নানা দ্বিধা চলছে সকলের মনে। সকলেই যখন কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে তখন এগিয়ে এল গঙ্গা, অনেকদিনের পুরনো শিকারী। "গোকুলকে

বাঘে ধরে খাবে আমাদের সামনে? আমার জান যায় যাক, তাকে খুঁজে বার করবই”—এই বলে বন্দুক হাতে এগিয়ে চলল গঙ্গা, সঙ্গে একটি সাহসী যুবককে নিয়ে। এ যে কত বড় দুঃসাহসের কাজ তা সহজেই অনুমেয়। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল গঙ্গারা। ঘন বন, দৃষ্টি রোধ করে দাঁড়িয়ে, কোথায় যে বাঘ লুকিয়ে আছে তা তাদের অগোচর, কিন্তু বাঘ তার নিজের গোপন জায়গায় বসে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে চারদিক, তাই অতি সাবধানে কোনও শব্দ না করে এগিয়ে চলল ওরা। খোয়াইএর রেখাঙ্কিত অসমতল জমি, চারিদিকেই ঝোপ-জঙ্গলে সমাকীর্ণ। এক পা এগোয়, চারিদিক দেখে নেয়, আবার এগোয়, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে, মাঝে মাঝে নিঃশব্দে গাছের উপর উঠে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নেয় যুবকটি! কোথাও কোন চিহ্ন আছে নাকি হতভাগ্য গোকুলের! উদ্‌গ্রীব হয়ে সংবাদের আশায় গঙ্গা চেয়ে থাকে তার দিকে, সে নিরাশসূচক সংবাদ দেয় নেমে এসে, আবার অন্য পথে শুরু হয় অন্বেষণের পালা। এমনি করে অরণ্যের গলি-ঘুঁচি খুঁজতে

খুঁজতে এক জায়গায় গাছের উপর মাথা তুলতেই দেখে খানিক দূরেই গোকুল চিৎ হয়ে পড়ে, তখনও সে জীবিত, আহত বাঘ তার জংঘার উপর বসে। বাঘের দৃষ্টিতে যাতে না পড়ে তাই অতি আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে ইঙ্গিত করল সে গঙ্গাকে যে, সেখান থেকে দেখা যায়। গঙ্গা তার বন্দুকটি পিঠে বেঁধে নিঃশব্দে খুব সন্তর্পণে উঠে গেল গাছে। বিড়াল যেমন করে ইঁদুরকে খেলিয়ে তারপর মারে, প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রুদ্ধ বাঘও তেমনি করে তিলে তিলে শেষ করছে। তার যে অঙ্গ একটু নড়ে অমনি সেটা তখনই কামড়ে ভেঙে দেয়। বেদনার্ত্ত হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিক খুঁজছে গোকুল, কোথাও কেউই কি তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না! বাঁচবে না সে হয়তো কিন্তু তার এই নৃশংস পরিণামের প্রতিকার করবার কেউই কি নেই? আসন্ন মৃত্যুর দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে শুয়ে তার হয়তো বা মনে পড়ছে তার ছোট্ট কুটিরখানি, তার স্ত্রী ও সন্তানদের মুখ। সহসা গঙ্গার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতে যেন একটু আশ্বাস পেল। তার সমস্ত প্রাণ যেন তখন অক্ষত চোখ দুটির দৃষ্টির ভেতর দিয়ে জ্বলজ্বল করছে। এতদিনের সাথীর এই অবস্থা দেখে গঙ্গার বুক ফেটে যেতে লাগল, কিন্তু গঙ্গা তখন নিরুপায়। বাঘ এমন-ভাবে চেপে বসে যে, তাকে গুলি করতে গেলে গুলি গোকুলেরও লাগবে এবং যেটুকু বা আশা আছে বন্ধুর গুলিতে তাও হবে শেষ। সময়ের গতি গেছে থেমে, পর মুহূর্ত যেন স্থির হয়ে গেছে। অপেক্ষা করে রইল গঙ্গা। একবার ওকে ছেড়ে বাঘ একটু মাথা সরাতেই তার কানের পেছন লক্ষ্য করে অগ্নিবর্ষণ করল গঙ্গার বন্দুক, সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ল বাঘের দেহ। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোকুলের মুখ, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলোর শেষ হাসির মত। 'বাঃ, ভাই গঙ্গা সাবাস! আব হমারা জান যায় তো ভী কোই হরজ নেহী।' সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করে যেন এই কটি কথা বলবার অপেক্ষায় সে ছিল। সাংঘাতিকভাবে আহত রক্তাক্ত দেহ তার চেতনাহীনতার মুখে ঢুলে এল। এই তার শেষ কথা।

এগার

বার বার তিনবার

১৯২৫ সাল, গ্রীষ্মকাল। আমার কর্মস্থল তখন হাজারিবাগে। একদিন সন্ধ্যার পর ডেপুটি কমিশনার মিঃ মার্ফি আমার বাড়ি এলেন এবং সক্ষোভে বললেন, "আমার বন্দুকের লাইসেন্স কেটে দেওয়া উচিত বিজয়বাবু" (Thy gun lisence ought to be cencelled Bijoy Babu)

"কেন কি হল ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

"জীবনের সবচেয়ে ভাল সুবিধা পেয়েও মানুষ-ধরা সেই বাঘ আজ বেঁচে গেল।" পরে বিস্তারিত যা বললেন তা এই রকম। সেইদিন সকাল আটটায় বড়কাগাঁওর পথে আট মাইল দূরে ওদোরনার জঙ্গলে মিঃ মার্ফি সদলবলে শিকারে যান। ছোট হরিণ, মুরগী, ইত্যাদির মেশান হাঁকোয়াতে যা বেরোয় তাই শিকার করার উদ্দেশ্য। রাস্তার উত্তর দিকের বনের কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি লোক দেখে জঙ্গলের মধ্যে একটু খোলা জায়গায় দুই তিনটি বড় শাল গাছ, তার ছায়াতে একটি বড় বাঘ শুয়ে। তাই দেখে মনে হল, হয় মরা বাঘ নয়তো ঘুমুচ্ছে।

দেখেই তো তার বুক শুকিয়ে গেছে। সে তখনই নিঃশব্দে পা টিপে টিপে পেছিয়ে এসেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে মিঃ মার্ফির প্রধান শিকারীকে খবর দেয়। সে জানতো যে মিঃ মার্ফি এখানে শিকারে এসেছেন।

"অবস্থা শোচনীয় আরও এই জন্য" বলে চললেন মিঃ মার্ফি যে, "আমরা যে তিন-চার জন এক সঙ্গে শিকার করছিলাম, তাদের মধ্যে বাঘের সংবাদ পেয়েই লটারী হয় যে, বাঘকে কে মারতে যাবে এবং তাতে আমার ভাগ্যেই সে বাঘ শিকারের পালা পড়ে। কিছুদিন থেকে সেই টোড়ীর নরখাদক বাঘ এই দিকেই আসছিল। গরমকালটা

সে আসেপাশেই কাটায়। তখনকার লোকেদের বিশ্বাস এইটাই সেই বাঘ। অথচ আমার নিশানা এতই ভুল যে ঘুমন্ত বাঘ, a perfect sitter—কে গুলি করতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম। বন্দুক রাখবার আমি যোগ্য নই।

তিনি খুবই অনুশোচনা করতে লাগলেন। আমি বললাম, "আপনার অবস্থায় অনেকেই ঐ ভুল করত।"

"কেন ?"

"আপনি সংবাদ পেয়েই সেখান থেকেই নিশ্চয়ই রাইফেলে গুলি ভরে কাঁধে বা হাতে নিয়ে হেঁটে গেছেন।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি হাতে করেই নিয়ে গেছি প্রস্তুত হয়ে।"

"এবং পকেটে নিশ্চয়ই বেশি গুলি কয়েকটি নিয়ে হেঁটে অন্তত এক মাইল গেছেন সেখান থেকে।"

"বরং কিছু বেশিই হবে, কারণ আমার হেঁটে যেতে কুড়ি মিনিট লেগেছিল আর বেশ দ্রুতই চলেছিলাম।"

"আপনি এখনও যে রকম উত্তেজিত হচ্ছেন সেকথা বলতে গিয়ে, তাতে আমি আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে সংবাদ পেয়েই খুব উত্তেজিত হয়েছেন, তারপর আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, লটারীতে বাঘ মারবার ভার পেয়ে সে উত্তেজনা তীব্র হতে তীব্রতর হয়েছে। গিয়ে পৌছানর আগেই বাঘ পালিয়ে না যায় এই আশঙ্কাও মনকে অস্থির করে তুলেছে। বাঘকে দেখামাত্রই গুলি করেছেন।"

"এ সমস্তই সত্যি কিন্তু যে লোকটি বাঘের সংবাদ এনেছিল এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল, গন্তব্যস্থানে পৌছে তাকে অনেক দূর পেছনে রেখে অতি সাবধানে এগিয়ে চললাম। কোনও কোনও জায়গায় নিচু হয়ে মাটি থেকে শুকনো পাতা সরিয়ে, যাতে পায়ের চাপ পড়লে খচ্ মচ্ শব্দ না হয়। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখি বনের ভেতর একটি পরিষ্কার জায়গা (glade)। তার মাঝে

দু-তিনটি শাল গাছ, তারই ছায়ায় শুয়ে মস্ত বাঘ। আমি খুব সাবধানে ঘুরে বাঘের পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে গিয়ে গুলি করি।"

"সবই ঠিক কিন্তু আপনি ভুল করেছেন বন্দুক ভরে নিয়ে, যে জন্য আপনি সঙ্গের লোকটির কাছে আপনার বন্দুক ভরসা করে বয়ে নিয়ে যেতে দিতে পারেননি। বন্দুকে গুলি ভরতে হয়ত আধ সেকেণ্ড নেয়, বাঘ দেখার পরও সে সময়টুকু পেতেন। ঐ ভারি ডি বি রাইফেল বয়ে অতদূর যেতে হাত আপনার ক্লান্ত হয়েছে, তাই বন্দুকের ঘোড়া টেপ্‌বার সময় চোখ ও মনের সামঞ্জস্য হারিয়েছে। তারপর এই গেল এই গেল করে দম নেবার অপেক্ষা না করে নিঃশ্বাসের সমতা আসবার আগেই গুলি করেছেন। এ অবস্থায় নিশানা শতকরা নব্বই জনেরই ভুল হয়। যদি সব সত্বেও বন্দুক পাশে রেখে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হলে গুলি করতেন তবে ঠিক হত। বাঘ যদি তখন কোন কারণে জেগে উঠে পড়ত তাতেও ক্ষতি ছিল না, লক্ষ্য করবার বড় টারগেট পেতেন, তা ছাড়া নিশানা ও গুলি ছুঁড়তে লাগত হয়ত এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ। ততক্ষণ বাঘ চলতে শুরু করলেও নিশ্চিত তার মৃত্যু।"

মিঃ মার্ফি অনুশোচনায় হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়লেন। তাঁকে অনেক বোঝালাম। এও বললাম যে উত্তেজনা বর্জন করে মনের ধৈর্য যত দিন না অভ্যাস হয় ততদিন শিকারে নানারকম হিসাবে ভুল ও বিফলতা আসে। পরিশেষে বললাম, "লটারীতে যখন ওই নরখাদক আপনার শিকার হয়েছে তখন নিয়তি ওর মৃত্যুও আপনার হাতেই লিখে দিয়েছে। আজ না হোক কাল ওর নিয়তি তাকে নিয়ে আসবে আপনার কাছে। শিকারের অভিজ্ঞতা থেকে এই আমার স্থির বিশ্বাস।

এই নরখাদক বাঘের উপদ্রব কয়েক বছর থেকে হাজারিবাগ ও তৎসংলগ্ন হাজারিবাগের পশ্চিমে পালামৌর টোড়ী অঞ্চলে নিয়মিত চলছিল। হাজারিবাগে শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে,

দূরে পালামৌ সীমানা এসে মিশেছে। পালামৌর সদর ডাল্টনগঞ্জ থেকেও সীমানা পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূর এবং এই একশ' মাইলের প্রায় পঁচাশী মাইল সমস্তটাই পাহাড়ে জঙ্গলে খোয়াইয়ে চড়াইয়ে উৎরাইয়ে ভরা—কোথাও বা নিরবচ্ছিন্ন কোথাও বা ছাড়া ছাড়া। যে সময়কার কথা বলছি, সে সময়টায় একটিই মাত্র পথ ছিল হাজারিবাগ থেকে পালামৌ যাবার। গরুর গাড়ি চলবার উপযোগী এই পথেই কোনও মতে মোটরও যেত। এই সব অঞ্চলের ক্ষেত ও ফসল রক্ষার জন্য হয়তো চল্লিশ-পঞ্চাশটি মাত্র গাদা বন্দুকধারী ছিল। শিকারের উপযুক্ত পরিশ্রম সাহস ও অধ্যবসায়ী শিকারী খুব কমই ছিল। শিকার প্রচুর এবং গ্রামবাসীরাও শিকারে অংশ স্বেচ্ছায় সানন্দে দিত। যেখানে পয়সা, দেওয়া হয় রোজ দুআনা এবং আধসের ছাতু ও উপকরণ অর্থাৎ আরও দুআনা, এই চার আনাতেই লোকে সন্তুষ্টচিত্তে অক্লান্ত পরিশ্রম ও শিকার উপভোগ করত।

গ্রীষ্মের অগ্নিবর্ষী রৌদ্র এই সব পাহাড় অরণ্য ও প্রান্তরের সব ঘাস লতা পাতা ছোট ছোট গাছ দেয় দগ্ধ করে। রিক্তপত্র গাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকে প্রাণহীন। তলায় ঝরে পড়া শুকনো পাতায় গ্রামবাসীরা লাগিয়ে দেয় আগুন, কারণ পোড়া কালো মাটির কোলে যখন মহুয়ার সাদাফুলগুলি ঝরে পড়ে, সহজেই তারা সেগুলি চয়ন করতে পারে। গ্রীষ্মশেষে নেমে আসে বর্ষা, ছোটনাগপুরের পর্ব্বতময় ঢেউ দোলান পটভূমিকা যায় পরিবর্তিত হয়ে। নতুন প্রাণের সঞ্চারে সঞ্জীবিত হয় অরণ্য প্রকৃতি।

এই নরখাদক বাঘ, বর্ষায় ফিরে যেত পালামৌর টৌড়ী পরগণার জঙ্গলে। শীতের প্রথমে সে সেখান থেকে আস্তে আস্তে ক্রমে হাজারিবাগের দিকে আসত এবং তার সাধারণ খাদ্য বন্যজন্তুর সঙ্গে অন্যান্য বাঘের মতই গ্রাম উপকণ্ঠে যে সব গরু-মোষ চরতো তাদের খেত, কিন্তু তার রুচি অনুযায়ী সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে মানুষ খেত। তার বিশেষত্ব ছিল এই যে, মানুষ যাদের মারতো প্রায় সবই

মেয়ে এবং জাতে তেলী। যতদূর সংবাদ নিয়ে তখন জেনেছিলাম চব্বিশ-পঁচিশটি মানুষ এ বাঘের মুখে প্রাণ হারায়, তার মাত্র দুটি পুরুষ এবং এরা দুজনও জাতে তেলী। ব্যাপারটা হয়ত আকস্মিক কিম্বা কে জানে আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে এর কোনও সংযোগ আছে কিনা। মেয়েরা জঙ্গলে কাঠ ফল মূল এবং দড়ির জন্য সাবে ঘাস সংগ্রহ করতে যারা যেতো তাদের থেকেই এই বাঘ আহার্য সংগ্রহ করত।

সেই বছর শীতেই শোনা গেল হাজারিবাগের পশ্চিমে সিমেরিয়ার কাছে বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে। মিঃ মার্ফির প্রথমবারের হাতছাড়া হওয়া সেই বাঘ। খবর পেয়েই আমি আমার ভাগ্নে শচী ও হেদলাগের জমিদার শিকারী বন্ধু ইয়াকুব খান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম, সেখানে সত্যিই বাঘের অস্তিত্বের চিহ্ন আছে কিনা পরিদর্শন করতে। স্থানীয় একজন আমার জানা শিকারী ছিল। জাতে রাজপুত, সেও চলল সঙ্গে। গ্রাম ছাড়িয়ে তিন-চার মাইল বনের অন্তরালে আমরা পায়ে হেঁটে চললাম। এ জায়গাটা উঁচু-নিচু খোয়াইয়ে ভরা এবং জঙ্গল খুব ঘন। পরীক্ষা করতে করতে জলের ধারে বাঘের পদচিহ্ন পেলাম। মস্ত বাঘ এবং পুরুষ এ তার পদচিহ্নে সুস্পষ্ট। বাঘ এ বনেই আছে অতএব এখানেই শেষ, বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে এই স্থির করে আমরা ফিরে চলেছি। হঠাৎ চোখে পড়ল বনের দিকে যেতে আমাদের যে পায়ের দাগ পড়েছে তার উপর বাঘের পদাঙ্ক। তার মানেই তো বাঘের তত্ত্ব নিতে আমরা যেমন এগিয়ে চলেছি, সেও আমাদের পেছন পেছন চলেছে আমাদের তল্লাসে। পরস্পরে মুখ চাওয়াচায়ি করে আমরা পেছন দিকে ফিরে চললাম দেখতে যে, আমাদের ফেরার পথেও সে আমাদের অনুসরণ করছে কিনা। একটু দূর গিয়েই দেখলাম আমাদের অনুমান মিথ্যা নয়, ফেরার পথে আমাদের পায়ের ছাপের উপর তার ছাপ রয়েছে। পেছন থেকে আড়ালে অন্তরালে সে আমাদের অনুসরণ করে চলেছে,

ফাঁক পেলেই আমাদের যাকে বাগে পাবে শেষ করবে। শিকারীর জীবনে সে সম্ভাবনা তো আছেই সব সময়। পলকের আড়ালে অপেক্ষা করে থাকে মৃত্যু, লুকোচুরি খেলে, কখনও হয় তার জয় কখনও বা পরাজয়। বাঘ মিঃ মার্ফির শিকারের জন্য বন্দোবস্ত করেছে, তাই তাকে এড়িয়েই আমরা অমৃতির প্যাঁচের মত নিজেদের পথটিকে পরিক্রমা করতে করতে ফিরে চললাম, যাতে আমাদের সে অনুসরণ করছে কিনা সেটাও নজরে পড়ে।

সে বনেই কদিন মোষ বাঁধবার ব্যবস্থা করলাম। প্রথম দিন বাঘে মোষ ধরল না কিন্তু দ্বিতীয় দিনই খবর এল বাঘে মোষ মেরেছে। খবর পেয়েই সেখানে চলে গেলাম এবং দেখলাম মোষটিকে মেরে বাঘ টেনে নিয়ে গেছে। যেখানে ঝোপের আড়ালে তাকে ফেলে রেখে গেছে সেখানে মাচা করবার মত মাত্র একটিই গাছ কাছে আছে। সেই গাছেই তাড়াতাড়ি মাচা বাঁধালাম। ক্ষণস্থায়ী শীতের দিন শেষ হবার আগেই মিঃ ও মিসেস মার্ফিকে সেই মাচায় উঠিয়ে দিয়ে আমি অল্পদূরের একটি গাছের একটা উঁচু ডালে আশ্রয় নিলাম। সেটা ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই হু হু করে এগিয়ে এল রাত্রি। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনও একটা তিথি। গাছের পাতাগুলি ঝিকমিক করছে জ্যোৎস্নার আলোয়, মাটির উপর আঁকা ছায়ার আল্পনা। শীতের তীব্র কন্‌কনে্ হাওয়া মাঝে মাঝে জাগিয়ে তুলছে শিহরণ অরণ্যের শাখায় শাখায়, সেই সঙ্গে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনী ধরিয়ে দিচ্ছে। নিজের নিঃশ্বাসেরই উষ্ণ হাওয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে দৃশ্যমান হয়ে। মাঝে মাঝে হাতটাকে কোটের ভেতর ঢুকিয়ে নিজের শরীরের উত্তাপে প্রাণ সঞ্চার করে নিচ্ছি, সর্বাঙ্গ জমে আসছে কন্‌কনে হাওয়ায়। আশায় অপেক্ষায় শীতে যখন মন শ্রান্ত হয়ে এসেছে এমন সময় বাঘ এল চক্ চক্ করে নিজের মুখ চাটতে চাটতে। মরা মোষটি যেখানে পড়ে, তার কাছে গেল। মনে ভাবলাম, এবার আর সে মৃত্যুর হাত এড়াতে

পারবেন্না। হঠাৎ কিসে যে তার সন্দেহ জাগল মৃদুকণ্ঠে একবার সে শব্দ করল এবং দুচারবার এদিক ওদিক ঘুরে "হু-ম্-ম্-ম্" করে এক ঝঙ্কার দিয়ে আমার গাছের তলা দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার পদধ্বনি পেলাম কিন্তু আবছা আলোয় দেখতে পেলাম না তাকে।

মিঃ মার্ফিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হল? তিনি বল্লেন, "কিসে যেন সন্দেহ হওয়ায় ও চলে গেল, কি করা যায় এবার বলতো?" বললাম, "একবার যখন সন্দেহ জেগেছে তখন অপেক্ষা করা নিষ্ফল।" অতএব সেদিনও সে বাঘ মৃত্যুর হাত এড়িয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরই বোর্ড অফ রেভিনিউর মেম্বর পদে নিযুক্ত হয়ে মিঃ মার্ফি পাটনাতে চলে গেলেন কিন্তু মন তাঁর পড়ে রইল হাজারিবাগের বনে-জঙ্গলে। যাবার সময় বলে গেলেন, শিকার সম্ভাবনার বার্তা পেলেই চলে আসবেন এখানে।

কয়েকমাস পরেই ইস্টারের ছুটিতে এখানে শিকারে আসতে চান এই মর্মে আমায় চিঠি লিখলেন তিনি। আমি সেই অনুসারে সিমেরিয়ার কাছের বনেই শিকারের পরিকল্পনা করছি। এমন সময় খবর এল—হাজারিবাগ থেকে বাইশ মাইল দূরে লেপোর কাছে টুটিলওয়ার বাজার থেকে হাট সেরে বনের ভিতর দিয়ে গ্রামের পথে ফিরে চলেছিল কতগুলি পথচারী। শীত শেষ হয়ে গেছে, গ্রীষ্মের প্রখরতা তখনও হয়নি শুরু। এই পথচারীদের মধ্যে একজন দলছাড়া হয়ে একটু পেছিয়ে যায়। সে হঠাৎ দেখে প্রকাণ্ড এক বাঘ তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে রাস্তা পার হয়ে তার সঙ্গী-সাথীদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ঘুরে আসছে। যাঁহা দেখা, সে তাড়াতাড়ি পাশের একটি সালের গাছে তরতরিয়ে উঠে চলল আত্মরক্ষা করতে। বাঘের দৃষ্টি তার দিকে ছিলই, সেও সগর্জনে মুহূর্তের মধ্যে এসে সেই গাছে উঠতে শুরু করল। এদিকে প্রাণভয়ে ভীত পথচারী প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল—

"আরে বাঘ হো, খেলকেই হো, মারলেলকেই হো, বাঘ রে বাঘ ইত্যাদি।

প্রত্যেক জীবেরই অন্তর্নিহিত বাঁচবার প্রেরণা অপরিমেয়। সে দেখছে, বাঘ তাকে অনুসরণ করে গাছে উঠছে। তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একটি মাত্র চিন্তা তাকে তখন ঘিরে রয়েছে, তাকে বাঁচতে হবে, আত্মরক্ষা করতে হবে চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সে এ ডাল থেকে ও ডাল, মোটা থেকে সরু, ক্রমে আরও সরু ডালে উঠে চলেছে মগ ডালের দিকে। বাঘও, শিকার যখন হাতে পেয়েছি যাবে কোথায় ভেবে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলেছে। লোকটির সঙ্গী যারা এগিয়ে গেছিল এ চিৎকার শুনে একটু থমকে দাঁড়াল। কেউ কি তামাসা করছে তাদের সঙ্গে? নাতো, এতো সেই লোকটিরই কণ্ঠস্বর, তাদের সঙ্গীর। তাড়াতাড়ি তারা দৌড়ে চলল শব্দ লক্ষ্য করে। এসে দেখে ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে লোকটি তার ভার সইবার মত ক্ষীণতম সর্বোচ্চ ডালের উপর আর তার থেকে কিছু নিচে গাছের ডালে গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে বাঘের বিশাল ভারি দেহ, এ সেই নারীখাদক বাঘ। তারা সমস্বরে "ধুর রে, ধুর রে" ও লাঠিসোঁটা যার কাছে যা ছিল মাটিতে পিটতে শুরু করায় বেগতিক দেখে বাঘ গাছ থেকে নেমে পালাল। গাছের উপরের লোকটির তখন হাত পা থর্‌থর্ করে কাঁপছে। কোনমতে সঙ্গীরা মাথার পাগড়ী খুলে তাই দিয়ে তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনে। খবর পেয়েই আমি সেইখানে গেলাম এবং দেখলাম নরম সাল গাছের তিরিশ ফুট ওপর পর্যন্ত বাঘের নখের দাগ রয়েছে।

মিঃ মার্ফিকে লিখলাম, শিকারের বন্দোবস্ত প্রস্তুত, পত্রপাঠ এস। তিনি ও মিসেস্ মার্ফি আসাতে ঘটনাটি তাঁদের সব বললাম। তাঁরা তো হেসেই অস্থির। বলেন, যে এ গল্প কথা, বড় বাঘ গাছে ওঠে এও কি সম্ভব?

আমি তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। বাঁশের সিঁড়ি আগেই করিয়ে রেখেছিলাম। তা দিয়ে উঠে ওঁরা দেখলেন নখের দাগ গাছের গায়ে, তখন বিশ্বাস হল এবং বিস্মিত হলেন তাঁরা। লোকটির মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরে আসার কথাই মনে হতে লাগল সকলের।

সেই গাছটির কাছের বনেই সেবার মোষ বাঁধা হল। বাঘে মোষ মেরেছে খবর পেয়েই আমরা গেলাম সেখানে। মরা মোষটির কাছেই মাচা, সেখানে বেলা থাকতেই গিয়ে বসলাম। মিঃ ও মিসেস মার্ফিকে বললাম, বাঘ যে রকম নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে তাতে বেলা থাকতে থাকতেই আজ সে আসবে। আমার ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হলনা। আমরা বসার অল্প পরেই বাঘ এল। এবার তার পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছিল। বন্দুক তুলে লক্ষ্য করে মিঃ মার্ফি একটি গুলি করতেই বাঘ উল্টে পড়ে গেল। এমনি করে তিনবারের বার মিঃ মার্ফির হাতেই শেষ হল তার নারীখাদক জীবনের।

বার

বাইসন

১৯১৬ সালের এপ্রিলের শেষ দিনে ভোরের অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে প্রথম বাইসন দেখি পালামৌর চেমো গ্রামের সামনে। তিরিশ-চল্লিশটি বাইসন নিয়ে এই যূথ। যূথপতি এবং যূথের অন্যান্য সকলেরই ঘন কৃষ্ণ সুপুষ্ট দেহ, দেড় টন ওজন তো হবেই হয়তো আরও কিছু বেশি। প্রকাণ্ড মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকান সুতীক্ষ্ম একজোড়া শিং যার গোড়ার পরিধি প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি। কোয়েলের ধারে গজিয়ে ওঠা নতুন ঘাস খেয়ে চরতে চরতে ওপারের মেরালের সংরক্ষিত ঘন বনে ঢুকে গেল। সংরক্ষিত বনে বিনা ছাড়পত্রে শিকার নিষিদ্ধ এবং শিকারের আইন ভঙ্গ করলে সমূহ বিপদ সুনিশ্চিত জেনে তাদের সেবার শুধু দূর থেকে দেখেই ক্ষান্ত হলাম। তখনও তাদের অভ্যাস, স্বভাব ও ভাবধারার কোন পরিচয়ই জানতাম না। কিন্তু দেখবার আগেই এই বাইসন বা 'গওর'য়ের খ্যাতি এবং অখ্যাতি কিছুদিন আগে রোদো সিঞ্জো ও বিজকা গ্রামের অধিবাসীদের কাছে শুনেছিলাম এবং তাতে এতই ঔৎসুক্য বেড়েছিল যে, স্বচক্ষে দেখবার ও তথ্য সংগ্রহের আশায় এই অঞ্চলের বনে বনে দু তিন দিন ঘুরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছি তাদের অস্তিত্বের চিহ্নও চরাগাই (যেখানে চরে) মাত্র দেখে।

সুরগুজা রাজ্য সীমা সংলগ্ন পালামৌর দক্ষিণ পশ্চিমের রাঙ্কা ও ভাণ্ডারিয়া থানা এলাকার এই ছোট বড় উঁচু নিচু পর্বতসংকুল অঞ্চল গহন অরণ্যে ঢাকা। পথ অত্যন্ত দুর্গম। পাহাড়ের গা বেয়ে যে সংকীর্ণ পথরেখা কখনও উঠে কখনও নেমে সর্পিল গতিতে চলে গেছে তাতে পথিক চলে হয় পায়ে হেঁটে নয় ঘোড়ায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় মহাজনদের লাদনা বলদের দল ধীর মন্থর গতিতে দলে দলে পিঠে করে বহন করে নিয়ে চলেছে বোঝা। দ্রব্যসম্ভার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অথবা গ্রাম থেকে গারোয়ার বাজারে নিয়ে যাবার অন্য কোনও যানের

পথ নেই, তাই হয় মানুষ, নয় বলদই একমাত্র ভারবাহী। এই লাদনা বলদের দলের প্রত্যেকটির গলায় থাকে বিভিন্ন আকারের কয়েকটি করে ঘণ্টা, কোনটি বা ধাতু নির্মিত, কোনটি কাঠের। বহুদূর থেকে শোনা যায় সমবেত এই বিচিত্র ঘণ্টাধ্বনির রেশ, প্রথম উদ্দেশ্য—হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের সচকিত করে তোলা, দ্বিতীয় কোনটি দলছাড়া হয়ে গেলে তার গলার ঘণ্টার শব্দ লক্ষ্য করে তাকে খুঁজে বের করা সহজ হয়।

গয়ার দক্ষিণ সীমা ও উত্তর পালামৌর গোয়ালারা এই গভীর অরণ্যে দলে দলে হাজার হাজার গরু মহিষ নিয়ে আসে চরাতে। শীতের শেষে যখন সমতল দেশে বইতে থাকে গ্রীষ্মের উষ্ণ নিঃশ্বাস, শ্যামলিমার ক্ষীণ আভাসটুকুও হয়ে আসে নিঃশেষ, তখন এরা এদের গোধন নিয়ে সুরগুজার অরণ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমশ তিন চার হাজার ফুট পাহাড়ের শিখরের দিকে উঠতে থাকে। এখানে তখনও শীতের ছোঁয়া লেগে থাকে অরণ্যের ছায়ায়, ঘাস পাতা থাকে সজীব। এরা যেমন পাহাড়ের উপরে চরতে চরতে উঠতে থাকে, মাংস লোলুপ বাঘ, নেকড়ে, চিতা, হায়নাও করে এদের অনুগমন এদের অলক্ষ্যে এবং সুযোগ পেলেই নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। প্রথম বর্ষার সজল কাজল ছায়া নিয়ে আসে ঘরে ফেরার আহ্বান। আবার নেমে চলে এরা অরণ্য থেকে জনপদের অভিমুখে, মৃত্যুর অনুচর মাংসাশি জীবরাও অরণ্যসীমা পর্যন্ত চলে পেছন পেছন।

পথ চলতে চলতে কোথাও বা চোখে পড়ে এই নিবিড় অরণ্যের মাঝে দূরে নিচে খেলাঘরের ছোট ছোট গুটিকয়েক লাল খোলার চালের ঘর, একটুখানি খোলা জায়গায় দ্বীপের মত জেগে আছে মানুষের অস্তিত্বের বার্তা ঘোষণা করে। দু-চার জন দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী যুবক জমিদারদের কাছ থেকে আবাদোপযোগী কিছু জমি বন্দোবস্ত নেয়, বন জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করে চাষ করে, বন্যপশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করে, রচনা করে বাসের জন্য কুটির। ক্রমে তারি আত্মীয়

বন্ধু এসে বাসা বাঁধে আসে-পাশে। তারা আনে তাদের গরু, মোষ, হাল, বলদ। দিন, মাস ও দীর্ঘ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকৃতি ও বন্য পশুর সঙ্গে সংগ্রাম করে গড়ে তোলে ক্ষুদ্র গ্রাম। এমনি করে গড়ে ওঠা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের কথা মনে পড়ে, নাম গৌড়গাড়া। এখানকার রামশরন রাউতের বাড়িতেই ছিল ভাল দুহাজার দুগ্ধবতী গাভী, এ ছাড়া আরও বহু গোসম্পদ ছিল তার জঙ্গলের বাথানে। তার এক একখানা সর্ষে ক্ষেতই ছিল প্রায় আধ মাইল লম্বা। আবার এমনও অনেক সময়ই হয় যে, প্রকৃতি ও বন্য হিংস্র পশুর সঙ্গে সংগ্রাম করে ঠিক যখন গ্রামটি গড়ে উঠছে এমন সময় বে-অগ্রণী তার মৃত্যু বা কোনও রোগের প্রাদুর্ভাবে গরু মোষ মরে গেলে, কিম্বা বাঘ ও বন্যজন্তুর উপদ্রবে কোনও বিপদ ঘটলে, সরল আদিবাসী প্রজারা সেটা দেবতার কোপ বা ভৌতিক উপদ্রব মনে করে সে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যায়। অরণ্য আবার ক্রমে সব গ্রাস করে নেয়। অতি দীন দরিদ্র তারা, জগতে নিজস্ব সম্পত্তি বলতে যা তা এতই অল্প যে এক আবাস ত্যাগ করে যাওয়া তাদের পক্ষে কিছুই দুরূহ নয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমনি একটি পরিত্যক্ত গ্রামের চিত্র, রাঙ্কা রাজের বৈরীয়া গ্রাম। ভগ্ন গৃহপ্রাচীর স্তূপে পরিণত হয়েছে, জনমানবের কোনও চিহ্নও নেই। পল্লবঘন আম্রকুঞ্জ, কোথাও বা বট-অশ্বত্থ, একদিন যে গ্রাম ছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোথাও কোথাও মানুষের অধিকারের অতীত স্বাক্ষর লেখা রয়েছে ক্ষেতের আলের চিহ্নে। অসংস্কৃত একটি দীঘি পদ্মবনে ঢাকা, তাতে দলে দলে হরিণ এসে জল খেয়ে যাচ্ছে, আমায় দেখে বিস্মিত হয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। মানুষ এদের কাছে এতই অপরিচিত। এদিকের সংরক্ষিত বনে এমন বহু পরিত্যক্ত গ্রাম আছে।

এই দুর্গম অঞ্চলে সাধারণত সরকারী অফিসারদের বিশেষ গতায়াত ছিল না, বড়জোর বছরে একবার কেউ কেউ যেতেন, কেউবা পরিদর্শন করতে, কেউ শিকার করতে। অশ্বারোহণে অপারগ হলে

খাটুলী ছিল তাঁদের যান। একটি দড়ির খাটিয়াকে উল্টে দিয়ে তার চার পায়ার সঙ্গে বাঁশের বাঁকারী বেঁধে তার ভেতর দিয়ে বাঁশ পার করে দেওয়া হত এবং দুপাশে পাল্কীর মতন কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত—এরই নাম খাটুলী। এখানে কেউ বেশিদিন থাকতে চাইতেন না। ম্যালেরিয়া এবং সঙ্গহীনতাই তার একটি কারণ। যে সব পুলিশ কনেস্টবল বা দারোগাকে শাস্তি দেওয়া হবে—তাদের এখানে বদলি করা হত। তাতে তাদের বিশেষ ক্ষতি ছিল না রাজ-প্রতিনিধি হয়ে তারা সেখানে রাজত্ব করত। রাজার তশীলদাররাও তাই, তারাও যত পারত প্রজাদের শোষণ করত।

১৯১৫-র ডিসেম্বরে যেদিন এই অঞ্চলের কুদরুম ক্যাম্পে এসে এ এস ও শ্রীধনমসি পান্নার কাছ থেকে সেটেলমেণ্টের চার্জ নিলাম, তার দুদিন আগে গ্রামের প্রান্তে শ্রীধনমসি পান্নার তাঁবুর কাছেই তাঁর অস্থায়ী আস্তাবলে বড় বাঘ এসে তাঁর ঘোড়া খেয়ে গেছে। তার পরের ক্যাম্প কাহ্লারের তীরে বাবদরীতে যখন, তখন একদিন আমার চাকরের বাপ এসে মহা কান্না—একদিন তার ছেলেকে ধরে। সে কয়েকজন পথচারীর সঙ্গে রাঙ্কা থেকে আসছিল। বেলা বারটা একটার সময় পথে এক জায়গায় একটু এগিয়ে আসে দল ছেড়ে। এক নালার ধারে এসেই দেখে সামনে এক বাঘ পথ আগলে বসল। সে তো দেখেই প্রাণপণে চিৎকার "দৌড়িহা হো, বাঘ হো, পকড়লেই হো" ইত্যাদি এবং তার হাতে যে লম্বা লাঠি ছিল মাটিতে পেটা শুরু করে। ওদিকে বাঘ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার ল্যাজটা এদিক থেকে ওদিক সঞ্চালিত করে মাটিতে পটকাতে থাকে, ভাবখানা যাবে আর কোথায়? ইতিমধ্যে "আওয়াথি হো" করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সঙ্গী-সাথীরা এসে পড়ে হল্লা করায় বাঘ একটু সরে যায়, ওরাও পার হয়ে পেছনে চাইতে চাইতে কোনমতে এসে পৌঁছয়। মহাকান্না, এমন ভয়াবহ অঞ্চলে তার ছেলেকে সে রাখবে না।

এমনি দুর্গম অরণ্য পর্বতের মাঝে বিজকা গ্রাম। ১৯১৬ সালের

এপ্রিলে কোয়েল নদীর তীরে পারুরোতে যখন আমার ক্যাম্প, তখন সেখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে বিজকাতে গেলাম। সে গ্রামের মাহাতো বা সর্দার বাইসনের সংবাদ দেবার সময় বলল যে, এরা সাধারণত মানুষের সব সংস্পর্শ এড়িয়ে জনশূন্য দূর জঙ্গলে থাকে যেখানে মানুষের গলার স্বর পর্যন্ত পৌঁছায় না। যূথবদ্ধভাবে বিচরণ করে তারা এবং বনরাজ ব্যাঘ্র এদের সম্মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে সাহসী হয় না। কচিৎ যূথভ্রষ্ট দু-একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে বাগে পেলে শিকার করে। কিন্তু যদি মানুষ এই বাইসনদের গতিপথে পড়ে যায় এবং তাদের সন্দেহ উদ্রেক করে তাহলে ওরা হয়ে ওঠে দুর্ধর্ষ, হিংস্র, তখনই তাকে শিং দিয়ে শেষ করে ফেলে। এই প্রসঙ্গে সে মিঃ ফ্র্যাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়লের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলল তার নিজের প্রত্যক্ষ করা।

আই-সি-এস ফ্র্যাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়ল ছিলেন পালামৌতে ডেপুটি কমিশনার ১৯০০ সাল থেকে ১৯০২ পর্যন্ত। গ্রামবাসী সকলের সঙ্গেই তাদের আপন জনের মত মেলা-মেশায় এবং সুখ-দুঃখের খোঁজ খবর ও ভার নেওয়ায় তাঁর খুবই সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন তাদের সহায় ও সৎ পরামর্শদাতা। অন্যদিকে তাঁর শিকার, অসীম সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁকে সারা জেলায় এনে দিয়েছিল বিশ্বাস, অনুরাগ ও প্রসিদ্ধি। একদিন এই বিজকাতে এসে তিনি ঠিক করেন বাইসন শিকার করবেন। গ্রামের সর্দার ও বৈগা (পুরোহিত) দুই দেশী গাদা বন্দুক এবং সঙ্গে আরও দু-একজনকে ও তাঁকে নিয়ে গেল সেই গভীর বনে বাইসনের সন্ধানে। দূরে জঙ্গলের মাঝে একটু খোলা জায়গার ধারে দেখা যায় এক বাইসন যূথকে। অতি সন্তর্পণে গাছের ঝোপের আড়ালে তাদের দৃষ্টি ও ঘ্রাণ এড়িয়ে গুলি করবার উপযুক্ত কাছে পৌঁছে মিস্টার লায়ল বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করেন যূথপতিকে। তখনকার দিনে আগ্নেয়াস্ত্র আজকের দিনের মত উন্নত ছিল না, গুলি লাগা সত্ত্বেও যূথশুদ্ধ

যূথপতি পালিয়ে যায় রক্ত বিন্দুতে তার গতিপথ চিহ্নিত করে। গুলি যখন লেগেছে তখন ও তো মরবেই, বিশেষত লায়ল সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্য, এই বিশ্বাসে এগিয়ে গেল শিকারীরা সর্বাগ্রে, উৎসুক বৈগা। হঠাৎ মিঃ লায়ল দেখেন ছুটতে ছুটতে তারা ফিরে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তারা বলল যে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় যেতেই সহসা ফিরে দাঁড়ায় যূথপতি এবং ক্রুদ্ধ আক্রোশে বৈগাকে পেড়ে ফেলে সিং দিয়ে তার পেট ও সর্বাঙ্গ চিরে ফেলে, কিন্তু তাতেও তার রোষ শান্ত হয়নি। সে ফোঁস ফোঁস করে ফোঁপাচ্ছে এবং শিঙে করে তার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলছে, আবার সেখানে গিয়ে তাকে ফুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে শিঙ দিয়ে, যেন প্রতিশোধ আকাঙ্খা তার নিবৃত্ত হচ্ছে না। সব শুনে মিঃ লায়ল বললেন, "বন্দুকধারী দুজন মাত্র আমার কিছু দূরে পেছনে থাক, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। যদি দেখ বাইসন আমাকে মেরে ফেলেছে তখন তোমরা গুলি কোরো বা পালিও। যতক্ষণ আমি না মরি তার আগে যদি তোমরা গুলি কর তাহলে ফিরে উল্টে আমি তোমাদের গুলি করে শেষ করে দেব।" এই বলে কি করতে হবে বেশ করে তাদের বুঝিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি। কিছুদূরে পেছন পেছন চলল সর্দার ও আরেকজন। যেখানে চলেছে আহত বাইসনের তাণ্ডব-লীলা সেই খোলা জায়গার ধারে একটি বড় শাল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি রুমাল বার করে নাড়তে লাগলেন ক্রুদ্ধ বাইসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। চোখ পড়তেই প্রতিহিংসার নেশায় উন্মাদ সে, তখন বৈগার ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ ছেড়ে শিং বাগিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে এল সোজা মিঃ লায়লের দিকে। সর্দারের কথায় "আমরা তো হুজুর তখন বুঝলাম সাহেব তো মরেছেই এবার আমাদেরও পালা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালাব কি না ভাবছি। সাহেব স্থির হয়ে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে, অচল অটল যেন গ্রাহ্যই নাই। গওর যখন মাত্র দশ বারো হাত দূরে, তখন বন্দুক তুলে সেই মাথা

লক্ষ্য করে গুলি করলেন একবার দুবার। হুড়মুড় করে এসে বিশাল মাথা গওর লুটিয়ে পড়ল সাহেবের পায়ের কাছে, সাহেব এক তিল নড়ল না।”

এই কাহিনী শুনে আমার বাইসন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও শিকারের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল, কিন্তু সে যাত্রায় আর সে ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়ে ওঠেনি। পরে যখন পালামৌ খাসমহলের ভার পাই তখন বাইসন শিকারের রোমাঞ্চকর উত্তেজনার অভিজ্ঞতা লাভের যথেষ্ট সুযোগ এসেছে।

হিংস্র পশু শিকারে আত্মবিশ্বাস দুর্দমনীয় সাহস এবং ভয়ের যত বড় কারণই থাক, তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করার দু-তিনটি ঘটনায় ও অঞ্চলে আদিবাসী, অরণ্যবাসী, বড় অফিসার ও শিকারীদের মধ্যে আমার একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল। পালামৌ খাসমহলের ভার নিয়েই বাইসন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। বাইসনকে ওরা বলে ‘গওর’। জানলাম, বাইসনরা তৃণভোজী। গভীর বনের মাঝে যে পরিত্যক্ত গ্রাম ও তার লাগা ধান ক্ষেত বা নালা নদীর ধারে বড় গাছ খুব সহজে জন্মায় না, ছেয়ে যায় অজস্র ঘাসে। বর্ষার জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে বাধা পায় এই ঘাসের বনে। তাতে সারা জায়গা হয়ে ওঠে সাঁৎসেতে, ঘাসরা আরও জোর পেয়ে মাথা তোলে, কোথাও কোথাও হয়ে ওঠে হাতীর পিঠ সমান উঁচু। এমনি জায়গা বাইসনের প্রিয় বিচরণ ভূমি।

ধ্যানমগ্ন নেতারহাট পাহাড়ের তিনহাজার আটশ’ ফুট উন্নত শিখর থেকে চঞ্চলা ঘাঘরী প্রপাত ধাপে ধাপে নেমে এসে নালা বেয়ে গিয়ে মিশেছে উত্তর বাহিনী কোয়েলের সঙ্গে। নালাটি অধুনালুপ্ত পাণ্ড্রা নামে একটি গ্রামের কোল বেয়ে যাওয়ায় নাম নিয়েছে পাণ্ড্রানালা। এই নালার কোয়েলের সঙ্গে সঙ্গমের ধারেই আছে নোনা মাটি, ইংরিজিতে যাকে বলে Salt lick। সত্তর-আশী ফুট জায়গা নিয়ে জলার মত দেখতে। সেই নোনা মাটি চাটতে আসে হরিণ, শম্বর ও বাইসনের

যূথ। জায়গাটির নাম মুরাছাপ্পর। স্থির করলাম আগে কাছে থেকে এই বাইসন যূথকে দেখব।

১৯২০ সালের বর্ষাকাল। মুরাছাপ্পরের সেই জলার কাছে চার হাত লম্বা চার হাত চওড়া কোমর সমান এক গর্ত খোঁড়ালাম কাছের একটু উঁচু জায়গায়। তারপর গরুর গাড়ির ছৈয়ের মত বাঁশের কঞ্চি ও মাছুলানের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছৈ তৈরি করালাম। চারিদিক দিলাম ডালপালা দিয়ে ঢেকে। কিছুদিন আগে 'বেস্ট হ্যাণ্ড ল্যানটার্ণ' নাম দিয়ে কলকাতার সাতকড়ি দাস এণ্ড কোং সবে প্রথম তুডজন পেট্রোম্যাক্স নমুনা আনায় তার একটি কিনেছি। সেই আলোটি জ্বেলে সেই ছইয়ের উপরের একটি বাঁশের ডালার উপর রেখে তাকে একটি টুকরী দিয়ে ঢেকে দিলাম। টুকরীটিতে আগেই গোবর মাটি লেপে দেওয়া হয়েছে যাতে ভেতর থেকে আলো ফুটে না বেরোয়, এবং টুকরীর মাথা চিরে গরম হাওয়া বেরোবার পথ করা হল। একটি চোপের দড়ি দিয়ে টুকরীটি আটকে মাথার উপরের গাছের ডালের সঙ্গে কপিকল দিয়ে বেঁধে, সেই দড়ির প্রান্তটিকে আনা হল ছইয়ের ভেতর দিয়ে নিচের গর্তে। দড়িটি ধরে টানলেই যাতে টুকরীটি উঠে যায়। আরেকটি সুতো আলোর দীপ্তি নিয়ন্ত্রণ করবার যন্ত্রটির সঙ্গে বেঁধে ভেতরে আনা হল, গর্তের মধ্যে যাতে সেটা টানলেই আলোর দীপ্তি বেড়ে ওঠে। এমনি ভাবে প্রস্তুত হয়ে সন্ধ্যার ছায়া যখন নেমে আসছে এমনি সময় সেই গর্তের ভেতর গিয়ে বসলাম, মাথার উপর টুকরী ঢাকা আলো স্তিমিত করে রেখে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। নেমে এল রাতের অন্ধকার বনের ছায়ায় আঁধারতর হয়ে। পাশেই কোয়েলের জল পাথর থেকে পাথরে ও কিনারায় আহত হয়ে বয়ে চলেছে আপন পথে কলস্বরে ব্যক্ত করে তার বেদনার ভাষা। বহুক্ষণ কেটে গেল প্রতীক্ষায়। মশার তাড়নায় অস্থির হলেও নড়বার উপায় নেই। রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে শুনতে পেলাম ভারি জন্তুর সমবেত পদশব্দ। ক্রমে নিকট হতে

নিকটতর হতে থাকে শব্দ। স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকি। আরও কাছে, আরও কাছে, এবার এরা হুজবজ করে জলায় নেমেছে আমার সন্নিকটে। আস্তে সুতোটিতে টান দিতেই মাথার উপর হিস্-স্-স্-স্ করে ওঠে পেট্রোম্যাক্স, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার আলো। দড়িটি ধরে একটান দিতেই পলকের মাঝে উঠে যায় অন্ধকারের যবনিকা, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আলোর নিচে অন্ধকারে বসে দেখি। নিঃশঙ্কচিত্তে চরমান সেই বাইসন যূথ হঠাৎ সেই আলোকের প্রকাশে স্তম্ভিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়। অতি নিকট থেকে দেখি তাদের সেই ঘন বাদামী রঙের বিশাল নধর চিক্কণ দেহ, পিঠের উপর ঈষৎ উন্নত কুব্জ। ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ায়, তারপর ছুড়দাড় করে চলে যায় অরণ্যের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে।

দেখবার আশা তো মিটল, এবার জাগল শিকারের নেশা। পাণ্ড্রা নালার ধারে অতীতে যে গ্রামটি ছিল পাণ্ড্রা, এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই, ভাঙা আলের চিহ্ন কোথাও কোথাও ছাড়া। যে জায়গায় আবাদী ক্ষেত ছিল সেখানে দশ-পনের ফুট লম্বা ঘাস মাথা তুলেছে, এত ঘন যে মানুষের অগম্য। শীতের সময় সেই ঘাসের আগা শুকিয়ে ওঠে। আমার নির্দেশমত খাসমহল গ্রাম রুদের অধিবাসীরা তাতে লাগিয়ে দেয় আগুন। সে ঘাস পুড়ে গেল দিন কয়েকেই। সেখানে গজিয়ে ওঠে নতুন ঘাস, বাইসনের অতি প্রিয় খাদ্য। এই আগুন লাগাবার একটা পদ্ধতি আছে। একটা শুকনো খড়ের নুড়ো তৈরি করে একজন শুকনো ঘাসের আগায় আগুন লাগাতে লাগাতে যায়, যতখানি জায়গা পোড়াতে হবে ততখানি জায়গাকে চক্রাকারে ঘিরে। আর কয়েকজন ছোট ডালপালা নিয়ে চক্রাকারে প্রজ্জ্বলিত ঘাসের পরিধির বাইরের দিকের আগুনটা পিটিয়ে নিভিয়ে দিতে থাকে যাতে আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে সারা বনকে না গ্রাস করে ফেলতে পারে, কেবল মাত্র যতখানি জায়গা পোড়াবার প্রয়োজন ততখানিটাই পুড়তে পুড়তে যায় ক্রমশ চক্রাকার

পরিধির ভেতরের দিকে এবং বৃত্তের ভেতরেই নিঃশেষ হয়ে থামে আগুন।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে আমার কাছে খবর এল পাণ্ড্রার কচি ঘাসে চরতে আসছে বাইসন, শিকারের সুযোগ উপস্থিত। পাণ্ড্রার কাছে রুদের ডাকবাংলোয় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সামনে দিয়ে বয়ে গেছে উত্তর বাহিনী কোয়েল। তার ওপারেই শুরু হয়েছে রাঁচি জেলার সীমানা। বনের ঢেউ দূরে বুলবুল পাহাড়ের কোলে মিশেছে তিনহাজার চারশ' ফুট উচ্চ তার চূড়া। দক্ষিণে নেতার হাটের অভ্রভেদী চূড়া। নেতারহাটের উত্তর কোলে রুদের দুর্ভেদ্য বন দিনের আলোতেও ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার।

বাইসন শিকারের রীতি এই যে, হাঁকোয়া শিকারে মারা হয় না। পায়ে হেঁটে গিয়ে সবচেয়ে বড় মাথাওয়ালাটিকে শিকার করতে হয়। মেয়ে বাইসন বা অপ্রাপ্ত যৌবন বাইসন শিকার নিয়মবিরুদ্ধ। ভোরের আলোতেই এদের শিকার প্রশস্ত, কারণ প্রখর দিবালোকে অরণ্যের গভীর গহনে এরা আশ্রয় নেয়।

শেষ রাত্রে এসে আমায় শিকারে যাবার জন্য ডাকল ওখানকার রুদের শিকারী রামা ভোক্তা ও মনবাহাল। তখনই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক রামা ভোক্তা। পাতলা ছিপ্‌ছিপে কচি বাঁশের মত নমনীয় দেহ, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর। এ বনের আনাচ-কানাচ গলিঘুঁচি তার নখদর্পণে, তাকে অনুসরণ করে চললাম। রাতের অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ় রয়েছে। আঁধারের উৎসবে তারার বাতি তখনও ম্লান হয়নি। মুরগীর ডাক শুনে সময় অনুমান করে ডেকে এনেছে রামা। ভোর হতে তখনও বাকি আছে। গন্তব্য স্থান পাণ্ড্রার কিছু দূরে। পথের ধারে ঘাসের উপর বসে উষার অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। নিশীথের সুপ্তি ভঙ্গ করে শোনা গেল বাঘের "অ্যাঁ-ও-ও..."। সব সাথীকে ডাকছে—বলল মনবাহাল। কাছেই ওর মান অর্থাৎ থাকবার গুহা। বাঘের

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকমের শব্দ এদের সুপরিচিত। এরা যে তাদেরই প্রতিবেশী।

অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে দেখে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ চুপ চাপ করে চলার পর দেখতে পেলাম দূরে পাণ্ড্রা নালার ওপারে কালো কালো অস্পষ্ট ছায়া। বাইনাকুলার দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম বাইসনের মস্ত এক যূথ পাণ্ড্রার ধারের খোলা জায়গায় কচি ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে। এদের মারতে হলে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে হয় ওদের দৃষ্টির অন্তরালে। পাণ্ড্রার ধারে ধারে আমাদের পথ। শুকনো পাতা ডাল পথ থেকে আগেই সরিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিল, যাতে পায়ের নিচে শুকনো পাতার ক্ষীণতম খচ্‌মচ্‌ শব্দও না শিকারকে সচকিত করে তোলে। পাণ্ড্রা নালাটি বেশ গভীর এবং এঁকে বেঁকে চলে গেছে তার গতিপথ। বাইনাকুলার দিয়ে আগে দেখে নিলাম যূথপতি কোথায়, তারপর তার কাছে যাবার জন্য অতি সাবধানে পাণ্ড্রা নালার ভেতর দিয়ে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে কোনও ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুলে দেখে নিই, আবার এগোই। এমনিভাবে এগিয়ে যেখান থেকে তাকে বন্দুকের গুলির নাগালের মধ্যে পাব সেখানে আন্দাজ করে ধীরে ধীরে নালার থেকে উঠলাম। উঠেই দেখি সে তখন চরতে চরতে সরে গেছে কিন্তু আরও অনেকে আছে। পূবের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ভোরের আলো আমার বন্দুকের ব্যারেলের উপর পড়তেই চক্‌চক্‌ করে উঠল, তাতে একটি বড় বাইসনের দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। সে "বাঁ-আঁ-আঁ" করে বিপদসূচক শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে যূথের সত্তর-আশিটি বাইসন চরা থেকে ক্ষান্ত হয়ে যে-যেখানে ছিল মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। প্রথম সংকেত যে দিয়েছিল সে খুব জোরে "কোঁঃ—" করে শব্দ করল এবং মাথা ঝাঁকানি দিয়ে আমার দিকে চলতে শুরু করল। নিমেষের মধ্যে আমি তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম, মাথা নাড়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সে গুলি, কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেই বিরাট যূথ মাথা নিচু করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। এই-না দেখে আমার সঙ্গের শিকারীরা "ভাগিয়ে হুজুর, জান বাঁচাইয়ে" বলে নালায় নেবে দৌড়। আমি দেখলাম আর দেরি নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত আমার দিকে এগিয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে নিকট থেকে আরও নিকটে। বন্দুক তুলে সামনে যেটা বড় পেলাম তাকে এক গুলি, তার বিশাল দেহ পড়ে যেতেই আরেকটিকে, সে পড়তে ওরা তখন পেছন ফিরে দৌড়তে আরম্ভ করেছে। আরেক গুলি, দৌড়ে যাচ্ছে এমন একটিও পড়ে গেল। ছুড়দাড় করে বাকিগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল বনের অন্তরালে। কেবল পড়ে রইল তিনটি প্রকাণ্ড বাইসনের মৃতদেহ। কেবল যূথপতি আমার হাত এড়িয়ে চলে গেল, তাকে আর শিকার করা হল না, এই ক্ষোভ রয়ে গেল।

তের

চিতা—(১)

১৯১২ সাল। গিরিডি থেকে বদলি হয়ে সেটল্‌মেণ্টের কাজে গয়ার দক্ষিণ সীমান্তে এসে বাসা বাঁধলাম। শিকারে আমি এখনও শিক্ষানবীশ। নানা তীর্থগুরুর কাছে শিকারীর সাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করছি আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। শিকারের সুযোগ তখনও তেমন পাইনি, সখই বেশি। বড় বড় বনস্পতিবিহীন ছোট ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল, যাকে বলে বনছুলি তার মাঝে বিক্ষিপ্ত অনুচ্চ কতগুলি পাহাড় বনে ঢাকা, যার ওদেশী নাম ঘুটঘুরী। এই বনের রেশ গিয়ে মিশেছে দূর দক্ষিণের জঙ্গলে পাহাড়ে। সামনে অসমতল শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে এক একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের অধিবাসী চাষী গৃহস্থই বেশির ভাগ, তা ছাড়া আছে তাদের চাষের কাজ করবার জন্য দরিদ্র কামিয়া, ভুঁইয়া, মুসহর বহেলিয়া; যারা দিন আনে দিন খায়—পরোপজীবী। ছোট ছোট খড়ের ঘরে থাকে তারা, এত ছোট দরজা যে, দাঁড়িয়ে ঢোকা অসম্ভব, বসে ঢুকতে হয়। এ অঞ্চলে বড় বাঘের উপদ্রব কম। ভালুক চিতা, বনছাগল (chinkara), চিত্রা হরিণ (spotted deer) এমন কি শম্বরেরও আশ্রয় এই সব ঘুটঘুরী। সামনের লোভনীয় শস্যক্ষেত্র বড়রা রাতের আঁধারে গা ঢেকে এবং ছোটরা দিনের যে কোনও নিরালা প্রহরে এসে শস্যে ভাগ বসিয়ে যায়। চিতা বাঘ এ অঞ্চলে প্রচুর। ফাঁক পেলেই ছাগল গরু এমন কি বলদও এদের মুখের গ্রাস হয়। এরা যখন মানুষখেকো হয়ে ওঠে, ভীত গ্রামবাসীরা তখন ভূত বলে তাদের পূজো দিতে আরম্ভ করে। দরিদ্র কামিয়ারা সাধারণত ঘরের বাইরেই শোয়, গরমের দিনে তো বটেই, শীতের রাতও কেটে যায় ঢাবায় আগুন জ্বেলে তার পাশে শুয়ে বা মাটির বোড়সিতে (মালসাতে) আগুন কাছে নিয়ে। ভগবান এদের প্রতি উদাসীন, মানুষ এদের প্রতি ফিরে তাকায় না,

মানুষখেকো চিতারাও এদেরই উপর করে অত্যাচার। নিশুতি রাতে ঘুমন্ত পল্লীর আনাচে কানাচে তারা চোরের মত ঢোকে এবং প্রথমেই যাকে ধরে তার হয় গলা নয় মুখটি কামড়ে ধরে জীবন শেষ করে, কোনও শব্দ করবারও অবসর দেয় না। সাধারণ শিকারে এ জাতীয় মানুষখেকো চিতা সহজে মারা পড়ে না, অথচ বন্দুক বা ধনুক পেতেও এদের মারা চলে না, কারণ বাঘ বা অন্য জন্তুর মত এদের কোনও নির্দিষ্ট আবাস নেই। রাতে যাকে মেরে খেয়ে গেল, দিনে সেখানে খেতে আসে না, এমন কি সে গ্রামেও আসে না। জঙ্গল, ঝোপ, ঝাড় গাছের উপর এমন কি নালা বা গর্তেও এরা লুকিয়ে থাকে বা বিশ্রাম নেয়। বন্য পশুই যাদের খাদ্য এবং গভীর অরণ্যচারী চিতারা বড় এবং পুষ্ট, এর নাম ওদেশীরা দেয় চিতোয়া বা সোনাচিতয়া। গ্রামের আনাচে কানাচে যে চিতারা ঘুরে বেড়ায় তারা হয় পাৎলা লম্বা, এদের বলে লর্‌মি। লোকেদের বিশ্বাস এ দুই আলাদা জাত, কিন্তু সেটা মানতে পারিনি।

কখনও কখনও লোকালয়ে চিতা ঢুকেছে টের পেলে গ্রামবাসীরা চারিদিক ঘিরে ফেলে যাতে না পালাতে পারে। লোকজন এবং তাড়া খেয়ে কোনও ঘরের ভিতর ঢুকলেই তার দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয় তারা, তারপর সে ঘরের চালার উপর উঠে সেখানকার খাপরা সরিয়ে মারা হয়। আমার জানা, অনেকবারই এরকম করে চিতা শিকার হয়েছে।

আমার এক বন্ধু রায়বাহাদুর বিষুণদেও নারায়ণ সিংহ তখন লাতেহারে এস-ডি-ও। একবার এইরকম চিতা বাঘ ঘরে বন্ধ করা হয়েছে খবর পেয়ে গিয়ে ঘরের চালের উপর ওঠেন বন্দুক নিয়ে। খাপরা সরানর পর ঘরের ভেতর যথেষ্ট আলো পৌঁছানোর আগেই বাঘ এক লাফ দিয়ে তাঁর পা কামড়ে ধরে। সৌভাগ্যক্রমে কামড়টা পা পর্যন্ত না পৌঁছে পৌঁছয় তাঁর জুতার গোড়ালি অবধি। চিতা সেই জুতো নিয়ে মেঝেয় নামে। এই অতর্কিত আক্রমণে স্তম্ভিত

বিষুণদেওবাবু থতমত খেয়ে যান প্রথমটা, তারপর তাড়াতাড়ি খাপরার উপর উঠে তিন-চার জায়গার খাপরা একসঙ্গে সরান হয়। বাঘ ততক্ষণ উনুন ও হাঁড়িকুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, পরে তাকে গুলি করে মারেন।

এই হাজারিবাগ শহরে, যেখানে সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলের বোর্ডিং, এই গরমের ছুটির আগেও ছিল, সেই শচ বাড়িতে এক মেমসাহেব থাকতেন। তাঁকে স্থানীয় লোকেরা বলত কালী মেমসাহেব। ১৯২৭ সালের এক সকালে ভদ্রমহিলা সামনের দরজা খুলেই দেখেন তাঁর দোরগোড়ায় এক চিতা শুয়ে। তিনি তো তখনই দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁর বেয়ারা চাকররা জড় হয়ে হল্লা করায় বাঘ সেখান থেকে গিয়ে রাস্তার অপর পারে ঢোকে জাস্টিস সি সি ঘোষের কম্পাউণ্ডে এবং জানালা খোলা পেয়ে খালি বাড়ির ভেতর। লোকজন তখনই দৌড়ে খবর দেয় কাছের পুলিশ ট্রেনিং কলেজে। সেখান থেকে, যেসব এ এস পি'রা শিক্ষানবীশ ছিলেন, তাঁরা তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে আসেন এবং জানলা দিয়ে কয়েক গুলিতে বাঘটিকে মারেন।

বাঁশডিহার বন্ধু বাবু কালীপ্রসাদ সিংহের কাছে তখন শিষ্যত্ব নিয়ে শিকারের ট্র্যাকিং শিখছি। একদিন বনের ভেতর দিয়ে চলেছি কালীবাবু, তাঁর অনুচর দলেলওয়া এবং আমি। বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার তাদের আপন আপন পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে। পথরেখায় রেখে গেছে তাদের পায়ের ছাপ। কালীবাবু আমাকে চেনাচ্ছেন, "এটা হচ্ছে শেয়ালের পায়ের দাগ তা তো দেখেই বুঝতে পারছেন, কুকুরের পায়ের ছাপের মত ছাপ। এই যে শেয়ালের মতই পায়ের ছাপ কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন সামনের দু-পা বড় পেছনের পায়ের চেয়ে এবং নখের চিহ্নও পড়েছে, এটা হচ্ছে হায়নার পায়ের ছাপ। এই গোল গোল পাঞ্জা বাঘের পাঞ্জার মত কিন্তু আকারে ছোট, এ হচ্ছে চিতার। এ খুরের দাগ শুয়োরের" ইত্যাদি ইত্যাদি। নতুন শিকারী তখন আমি, কল্পনা তখন আমার বড় বাঘ পর্যন্ত পৌঁছয়নি, চিতা তাই বা কম

কি, সেও তো বাঘই বটে। কালীবাবুকে প্রশ্ন করলাম "এখানে চিতা পাওয়া যাবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মারবেন? তা আর কি আছে, কয়েকটা বক্‌রা (পাঁঠা) খাইয়ে দিলেই হবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি রকম? তাতে তিনি বললেন, "সারাদিন বনের কাছাকাছি ছাগল চরাবার বন্দোবস্ত করব এবং ঘরে ফেরার সময় তাদের একটিকে সেখানে বেঁধে রেখে যাবো। চিতা সেই সাড়া পেয়ে ও দেখে তার লোভ জাগবে, কিন্তু দিনের আলোতে কাছে আসতে সাহস করবে না, কাছাকাছিই লুকিয়ে থাকবে। সন্ধ্যার পর ছেরচরওয়া (যে ছেলেটি ছাগল চরায়) সব ছাগল নিয়ে ঘরে ফিরবে। একটি শুধু থাকবে পড়ে বাঁধা অবস্থায়। তাকে পড়ে থাকতে দেখে বাঘ মনে করবে ওটা বুঝি রয়ে গেছে, রাত হতেই এসে তাকে ধরবে। এমনি দু-এক দিন হলেই চিতার লোভ বেড়ে যাবে, সে আনাচে-কানাচেই থেকে যাবে। লোভে লোভে রোজই দেখে যাবে এদিকটা, তারপর একদিন পাঁঠা বেঁধে বসলেই সে যেই নিঃশঙ্ক হয়ে এসে ধরবে অমনি তাকে শিকার করা।"

চিতাকে ওরকম অভ্যাস করাবার মত আমার ধৈর্য মানল না। কথা হল পরদিনই শিকারে আসব। কালীবাবু দলেলওয়াকে বললেন, "এখানে ডিপ্টি সাহেব চিতা মারবেন, শিকারের সব বন্দোবস্ত করে দিবি।"

আমায় সংবাদ পাঠালেন সব প্রস্তুত, আপনি চলে আসুন। বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে চলে গেলাম। জন্তু জানোয়ারের পায়ে চলা পথের ধারে প্রকাণ্ড ন্যাড়া দুটো পাথরের চাঙড়। তারই একটির গায়ে একটা শালগাছকে গোড়া থেকে সত্ত কেটে এনে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে, যেন ওটা ওখানেই জন্মেছে। এমন কি যেদিকে তার সাধারণত রোদ পেত সেদিকটি এখানেও রোদের দিক করে রাখা হয়েছে। গাছ লাগাবার এই কায়দা বা মাচায় পাতা দেবার রীতি (পাতেড়না) দলেলওয়াই প্রথম শিখিয়ে দিল। কাটা শাল গাছটির

সঙ্গে দুচারটি ডালপালা দিয়ে পাথরের চাঙড়ের উপর এমন একটা অন্তরাল তৈরি করা হয়েছে যেখানে বসে স্বচ্ছন্দে আত্মগোপন করা চলে, সেখানে গিয়ে বসলাম। আমাদের কাছে প্রায় পঁচিশ ফুট সামনে পথের উপর বনকুলের ঝোপের সঙ্গে একটি পাঁঠা বাঁধা, আসেপাশে বাকিগুলি চরে বেড়াচ্ছে।

সূর্যাস্তের পর যারা ছাগল চরাতে এনেছিল তারা ছাগলগুলিকে নিয়ে ফিরে চলল গ্রামের পথে। যে ছাগলটি বাঁধা ছিল, দলের সব যাচ্ছে দেখে সেও যেতে চেষ্টা করল প্রাণপণে কিন্তু সে যে বাঁধা, ঘরে ফেরার পথ তার রুদ্ধ। সে ডাকতে শুরু করল। যখন দেখল তার ডাক উপেক্ষা করে তার দলের আর সকলে দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে তখন গলা ফাটিয়ে আকুল ক্রন্দনে মুখরিত করে দিল চারিদিক, "আমায় ফেলে যেও না, আসন্ন মৃত্যুর হাতে আমায় সমর্পণ করে যেও না তোমরা" এই যেন তার আপন ভাষায় বলতে চাইল।

আমার বিবেক কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "এ কি করছ, নিরীহ জীবকে হাত পা বেঁধে মৃত্যুর কবলে ফেলে দিয়ে শিকার, এই কি পৌরুষ?" কিন্তু শিকার করব বলে এসেছি, ফিরে গেলে যে চিত্তদৌর্বল্যের পরিচয় দেওয়া হবে। আমার হাতে তো বন্দুকই আছে, না না, ওকে আমি মারতে দেব না, তার আগেই চিতাকে মেরে ফেলব, নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিলাম বারবার।

রাত গভীর হয়ে আসে। পাখীরা অন্ধকার হতেই আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের নীড়ে। বন্যপশুও আত্মরক্ষা করেছে তাদের নিরাপদ স্থানে, শুধু সামনে দাঁড়িয়ে ছাগলটি বাঁধা। ভয়ে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে। দেখছি মাঝে মাঝে তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসছে। আমিও সমস্ত চেতনা জাগ্রত করে অপেক্ষা করে আছি। মনের ভেতর চলছে বিবেক ও শিকারস্পৃহার দ্বন্দ্ব। মনে মনে শুধু এই কামনা করছি ছাগলটির কাছে পৌঁছনোর আগেই যেন চিতা আমার দৃষ্টিপথে পড়ে। হঠাৎ দেখি বনের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে ছাগলটির দিকে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক চিতা। বিদ্যুৎবেগে তুলে নিলাম আমার বন্দুকটি, তার ক্ষিপ্রগতিতে সে এগিয়ে আসছে, এসে পড়তে তার বিলম্ব হবে না, চঞ্চল চিত্তে এক গুলি। শব্দে চিতা এক লাফে অদৃশ্য, গুলি তার লাগল না কিন্তু ছাগলটি যে বেঁচে গেল তাতে একটা মহা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। শুধু মাত্র তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে হাতে আসা চিতা পালিয়ে গেল, সেজন্য দুঃখ হল না তা নয়, তবে অন্তরের স্বস্তি তার উপর ছাপিয়ে রইল।

চৌদ্দ

চিতা—(২)

কালীবাবুর সঙ্গে চিতার অভিজ্ঞতা। কিছুদিন পরই পত্তই গ্রামের জমিদার বীরেন্দ্রবাবু আমন্ত্রণ জানালেন চিতা শিকারের। গয়ার দক্ষিণ আওরাঙ্গাবাদ মহকুমার পত্তই বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে অনেক ভেঁড়িহারের (মেষ পালক) বাস। বীরেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণে সেখানে যেতেই তিনি সানন্দে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। গ্রামের দক্ষিণে একটি ন্যাড়া পাহাড়, মস্ত মস্ত পাথরের চাঙড় সাজিয়ে স্তূপীকৃত করা আকৃতি, তাতে অসংখ্য গুহা কন্দর। এই পাহাড়গুলির দক্ষিণ পাদদেশ থেকে চলে গেছে ঢালু, তার কোথাও কোথাও আবাদী ক্ষেত। এই পাহাড়ের পাদদেশেই দক্ষিণে আম বাগান এবং মাটির দেওয়াল খাপরার চাল একখানি ঘর বীরেন্দ্রবাবুর পাকাপাকি শিকারের আস্তানা। বীরেন্দ্রবাবু এইখানে আমাকে নিয়ে গেলেন। পূব মুখো ঘরখানি, তার মেঝেয় মস্ত ফরাস পাতা। ঘরের উত্তর দেওয়ালে ছুটি ফুটো যেখান দিয়ে শিকার করা হয়। ফুটো দিয়ে দেখা যায় পাহাড়টি এবং সামনেই খুঁটিতে বাঁধা কালো একটি পাঁঠা। তার আসেপাশেই অজস্র ছাগল ভেড়া চরছে।

বীরেনবাবু বললেন, "খানিক দূরে যে সব বন আছে তা থেকে মাঝে মাঝে চিতা এসে আশ্রয় নেয় এই পাহাড়ের গুহায় কন্দরে এবং আসেপাশে যেসব ছাগল ভেড়া চরে তাদের ধরে খায়। এমনি যখন লোভ পেয়ে যায়, তখন কয়েকদিন থেকে যায় এখানে লোভে লোভে। সেই রকম সময়েই পাঁঠা বেঁধে আমি কবার শিকার করেছি। এবারও এরকম এসেছে খবর পেয়েই আপনাকে খবর দিয়েছি এবং এদিকে ছাগল চরাতে পাঠাচ্ছি কদিন ধরে তাদের লোভ উদ্রেক করতে। বিকেলে চিতা এসে পাহাড়ের মাথায় ওই পাথরটির উপর বসেছিল সতৃষ্ণ নয়নে···এদিকে তাকিয়ে সন্ধ্যার অপেক্ষায়। একটু আগেও তার

মাথা দেখা যাচ্ছিল ওখান থেকে। অন্ধকার হলেই সে আসবে নিশ্চয়ই।"

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে আসতে ছাগল ভেড়া নিয়ে যারা চরাতে এসেছিল, তারা চলে গেছে গ্রামে। ম্লান জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে কালো ছাগলটিকে আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান। তার সব আর্তনাদ ডাকাডাকি থেমে গেছে অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে, ত্রাসে। আমিও বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত, আজ এলেই শিকার করব। মৃত্যুভয়ে কম্পমান পাঁঠাটিকে দেখে বড়ই গ্লানি অনুভব করতে লাগলাম। মনের ভেতর বয়ে চলেছে কত চিন্তার ধারা। নেশা এমনিই জিনিস যে, সে যখন কাউকে পায়, পায় তার আয়ত্তের ভেতর, তার ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধকে দেয় আচ্ছন্ন করে। দৃঢ়মুষ্টি থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুবই শক্ত। মাতাল প্রতিদিনই প্রতিজ্ঞা করে মদ সে স্পর্শ করবে না, কিন্তু যখনই আসে নেশার সময় তার সংকল্প ব্যর্থ হয়ে যায়। অনাহারক্লিষ্ট স্ত্রী-পুত্র আপনজনের মুখের গ্রাস, শেষ সম্বল ছিনিয়ে নিয়ে সমর্পণ করে নেশার বেদীতে। শিকারও তেমনিই নেশা। মানুষের সহজাত করুণা মমত্ববোধ তার কোমল অনুভূতিগুলিকে অতিক্রম করে জাগিয়ে তোলে উত্তেজনাপূর্ণ উম্মাদনা, শিকারে সাফল্যলাভের তীব্র স্পৃহা। বিবেক এসে বাধা দেয়, কিন্তু ক্রমশ মন কঠিন হয়ে আসে, সে বাধা জোর পায় না।

হঠাৎ এক আর্ত চীৎকার "ম্যা—" তারপরই ছাগলটি লুটোপুটি খেতে লাগল মাটিতে। আমিও ক্ষিপ্রহাতে তুলে নিলাম বন্দুক। নিয়ম হচ্ছে চিতা এসে ছাগল মারবে, তারপর নিশ্চিন্তে বসে তাকে খেতে থাকবে, তখন ধীরে সুস্থে তাকে দেখে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করা। কিন্তু মন তখনও অতটা নিরপেক্ষ ও কঠিন হয়ে যায়নি। পাঁঠাটিরও অসহায় মৃত্যু দেখে তখনই বন্দুক তুলে আর কোনও অবসর না নিয়ে আবছা অস্পষ্ট আলোতেই এক গুলি করলাম। লক্ষ্যচ্যুত গুলি এনে দিল ব্যর্থতা।

মাসখানেক কেটে গেছে। গয়ার ভালুয়ারী গ্রামে আমার ক্যাম্প। সারাদিন কাজ পরিদর্শন করে শ্রান্ত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে ঘোড়া থেকে নামতেই কয়েকজন গ্রামবাসী এগিয়ে এল "হুজুর এখনই শিকারে যেতে হবে, চিতা একটা গরু মেরেছে ভারি সুবিধামত জায়গায়।" সারাদিনের শ্রান্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিমেষে সব চলে গেল শিকারের নামে। তখনই বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে।

গ্রাম ছাড়িয়ে কিছু দূরে জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কিছুদূর গিয়ে বনে ঢাকা একটি পাহাড়। পাহাড়ের শিখর থেকে একটি বিশাল প্রস্তর খণ্ড সুদূর অতীতে স্থানভ্রষ্ট হয়ে গড়িয়ে নেমে এসে পাহাড়ের দক্ষিণ পাদমূলে থমকে দাঁড়িয়েছে ঈষৎ পূব দিকে হেলে। প্রায় বারো ফুট উঁচু খাড়া সেই উপলখণ্ডের গায়ে একখানা বাঁশের সিঁড়ি গ্রামবাসীরা লাগিয়ে রেখেছে। তাই দিয়ে বেয়ে উঠে দেখি উপরটা বাটির মত, তার ভেতর বসে আত্মগোপন করবার মত চমৎকার জায়গা। এই প্রস্তর

খণ্ডটি থেকে প্রায় দশ বারো হাত উত্তরে আরেকটি খণ্ড, ওটির চেয়ে আকারে কিছু ছোট, তার উপরটা চোখা। এটির ঠিক পশ্চিমেই পড়ে আছে মরা গরুটি। স্থির করলাম একাই বসব কিন্তু সঙ্গী যারা ছিল তাদের মহা আপত্তি তাতে। "রাত্রে অজানা জঙ্গলে আপনি পথ চিনে ফিরবেন কি করে? ধরুন আমরা যদি ঘুমিয়েই পড়ি, আপনার ডাক নাই শুনতে পাই। এ আমাদের জানা, সাহসী লোক, একে কাছে রাখুন।" শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হল।

পাথরের উপর বাটির মত গর্তে আমি একজন গ্রামবাসীকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলাম। অন্য যারা এসেছিল চলে গেল। চারিদিকে নেমে এসেছে রাতের স্তব্ধতা। চাঁদ আমাদের পেছনের আকাশে, তাই পাশের প্রস্তর খণ্ডটি তার কালো ছায়া ফেলছে মরা গরুটির উপর। নিশুতি রাতে স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করছি, মাথা উঁচু করলেই পাথরের কানার উপর দিয়ে দেখতে পারি গরুটি, আবার মাথা নিচু করলেই অদৃশ্য। বহুক্ষণ অপেক্ষা, নিরাশ হয়ে পড়ছি, আজ আর সে আসবে না, এমন সময় মরা গরুটির কাছে পাথরের ছায়ায় কি যেন চলমান, দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখি নিঃশব্দে চিতা এসে সবে খেতে বসেছে। আমিও উল্লসিত হয়ে বন্দুকে হাত দিতেই আমার সঙ্গীও উৎসুক দৃষ্টিতে উঁচু হয়ে দেখল, দেখেই তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। ক্রমে তার গলা শুকিয়ে কাঠ। বন্দুক তুলেছি এমন সময় তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল খক্ খক্ খক্ কাশী। হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেল, চিতা অদৃশ্য। নিষ্ফল বিরক্তি, ক্রোধ ও নৈরাশ্যই সার হল সেদিন।

আরও কিছুদিন কেটে গেছে, গয়ার বেরনা বালুগঞ্জে আমার ক্যাম্প। কাছেই বনাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড পাহাড়। তার মাঝামাঝি থেকে এক মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া সমতল শীর্ষ আরেকটি পাহাড়ের ধাপ পাহাড়ের পুব উত্তর গা দিয়ে নেমে এসেছে। আরও পুব উত্তরে পাহাড় জঙ্গল। মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা ঝোপে-ঝাপে ভরা।

এই সমতল মাথাওলা পাহাড়টির চারিদিকে সোজা খাড়াই, একদিকে খানিক ঢালু, যেখানে-সেখানে ওঠা নামার কয়েকটি পথ আছে। স্থির হল এই পাহাড়ে একদিন শিকারে যাব। এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে গেলাম একাই বসব। হাঁকোয়া শিকার। হাঁকোয়ারা বড় পাহাড়টির সংযোগস্থল থেকে চারিদিক ঘিরে হাঁকোয়া করে আসছে পাহাড় থেকে। সেই ওঠা-নামার পথের দিকে এবং পথের উপরেই বাঁধের উপর আমি বসেছি। আমার তুপাশে স্টপরা। হাঁকোয়ারা তুইয়ে-চারে অথবা দলবদ্ধ ভাবে তাদের নির্দিষ্ট জঙ্গলটুকুর হাঁকোয়া শেষ করে পাহাড়ের খাড়া ধারে এসে পৌঁছতে লাগল। যারা পেছিয়ে ছিল তারাও তাড়াতাড়ি করে উপর থেকে মনোহর দৃশ্যের এবং ডিপ্‌টি সাহেব কি করে শিকার করেন দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আগে যারা ধারে পৌঁছেচে তাদের আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে আসতে লাগল এবং সামনেই অপর হাঁকোয়া যারা আরও পেছিয়ে আছে তাদের সঙ্গে হাঁকোয়ার চিৎকারে যোগ দিতে লাগল। আমি দেখলাম বাঘ তো এলই না অথচ এদের সমবেত চিৎকারে রীতিমত বিরক্তই বোধ হতে লাগল। কিন্তু আশার এমনি মোহ যে জঙ্গলটুকু নিঃশেষে হাঁকোয়া না হলে ভরা বন্দুকের গুলি বের করে নিতে পারি না। এমন সময় আমার ডান দিকের হাঁকোয়ারা যারা তখনও পাহাড়ের উপর, তারা জন কয়েক চিৎকার করে, উঠল "বাঘ যা-ত হ্যায়, বাঘ যা-ত হ্যায়।" তাদের বলার আগেই আমার দৃষ্টিপথে এক প্রকাণ্ড কুঁদো চিতা বাঘ ঝোপ থেকে ঝোপের অন্তরালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে আসছিল। কিন্তু, উপরের হাঁকোয়াদের "বাঘ যা-ত হয়ও শুনে" প্রায় আড়াইশো তিনশো হাঁকোয়ারা "বাঘ যা-ত হ্যায়" সমবেত ধ্বনিতে বাঘকে সচকিত ত্রস্ত করে তুলল। স্টপ যারা ছিল তারাও উৎসাহের প্রাবল্যে "উহে হ্যায়, উহে যা রহা হ্যায়, উহে হ্যায়, মারিয়ে" ইত্যাদি নানারকম কর্ণভেদী চিৎকার আরম্ভ করল, যেন তারা না দেখালে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। যদিবা বাঘ পেছনের হাঁকোয়াদের চিৎকারেও

নির্দিষ্ট পথে আসছিল। স্টপদের এই সোরগোল চিৎকারে খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ল্যাজ সোজা করে উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাল আমার থেকে বহু দূর দিয়ে। শিকারীদের উৎসাহের আতিশয্যে এবারও শিকার নিষ্ফল হল।

সেবারক.ম ক্যাম্প শেষ হওয়া প.র্যন্ত সে যাত্রায় গয়াতে আমার চিতা শিকার আর হল না, হল শুধু বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

পনর

চিতা—(৩)

চির বহমান কালের প্রবাহে পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই পাঁচ বছর কত স্মৃতিই রেখে গেছে, দিয়ে গেছে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। গয়া সেট্‌ল্‌মেন্টের কাজ শেষে বেতিয়া সেট্‌ল্‌মেন্ট, তারপর রাঁচি ও ধানবাদ ঘুরে আবার এসেছি ছোটনাগপুর সেট্‌ল্‌মেন্টের কাজে। ইতিমধ্যে বাঘ বড় ও ছোট কয়েকটিই শিকার করেছি।

১৯১৭ সাল। পালামৌর পাটন থানার কাছেই আমার ক্যাম্প। পাটন থানার ঠিক উত্তর থেকে বহুদূর বিস্তৃত পাহাড় জঙ্গল। এখানে ভালুক চিতাই বেশি। মাঝে মাঝে বড় বাঘও আসে। হরিণ এবং অন্যান্য শিকারোপযোগী জন্তু জানোয়ার প্রচুর। একদিন খবর পেলাম যে পাঁড়ে ঠাকুর রামের গ্রাম সগুনার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট একটু জঙ্গলের ধারে বাঘে বলদ মেরেছে। তখনই দেখতে চলে গেলাম সেখানে। গিয়ে সব পরীক্ষা করে দেখলাম চিতায় মারা, বড় বাঘের নয়। কাছে কোনও বড় গাছ ছিল না। ঘুটঘুরী ও নল বনের প্রান্তে কতগুলি ক্ষেত ধাপে ধাপে নেমে গেছে। তার আলের উপর মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাপ। বলদটিকে মেরে একটি শূন্য ক্ষেতের উপর ফেলে রেখে গেছে! সাবা করবার উপযোগী কোনও গাছ নেই। দেখে স্থির করলাম যেখানে বলদটি পড়ে আছে তার নিচের দিকের একটি ক্ষেতের আলের উপরকার কুলের ঝোপকে সামনে রেখে নিচু ক্ষেতটিতে গলা সমান গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর দাঁড়াব, যাতে আলের ওপর ঝোপের ভেতর দিয়ে আমার দেখা চলবে এবং সেই মত সব বন্দোবস্ত করতে বলে এলাম লোকজনদের।

সন্ধ্যায় আমার প্লেন বারো বোরের গান নিয়ে প্রস্তুত হয়ে সেই গর্তর মধ্যে পশ্চিম-মুখো হয়ে দাঁড়ালাম। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তার এক ধাপ উপরের ক্ষেতে মড়িটি পড়ে। দূরে জঙ্গলের শুরু। জ্যোৎস্না

রাত। চুপ করে বসে আছি, এই আসে এই আসে আশায়। একবার মাথা উঁচু করে দেখতেই চোখে পড়ল মড়িটার উপর কি যেন একটা জানোয়ার লাফিয়ে উঠল, তার মাথা এবং ঘাড় মড়ির ওপাশে ফোলা পেটের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। তখনও খেতে শুরু করেনি। তারপর যতদূর সম্ভব নজর করে দেখলাম চিতাই বসে খাচ্ছে। একটু ছোট মনে হচ্ছে, চিতাই তো? হাঁ, তাই। বন্দুক তুলে স্থির করে একটি গুলি। আজও মনে পড়ে রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে শব্দ পেলাম পাই-ই-ই করে গুলিটা পার হয়ে চলে গেল, যাকে লক্ষ্য করে মারলাম সে পড়ে গেল। উঠে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি চিতা

নয়, মস্ত এক কুঁদো বন বেরাল। গুলি তার দেহ এপার ওপার হয়ে চলে গেছে। তার ক্ষুদ্র দেহ গুলির প্রচণ্ড গতিবেগকে রোধ করতে পারেনি, ওর দেহের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গুলি তার স্বাভাবিক গতিতে চলে গেছে। কিন্তু কি করে কি হল? ভাবতে লাগলাম, বেড়াল কি করে আমার চোখে চিতার মত দেখাল। জন্তু জানোয়ার বা যে কোনও জিনিসকেই আমরা সাধারণত সোজা সামনে দেখতে অভ্যস্ত এবং সেইভাবেই তাদের পরিমাপ দেখতে অভ্যস্ত। উপর থেকে যখন দেখি তখন সেই জিনিসই মাপে ছোট বা খাটো দেখায়, কিন্তু নিচের থেকে দেখতে গেলে দেখায় বড়। আমি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে (Position) গর্তের ভেতর থেকে মাটির সমরেখায় আকাশের পটভূমিকায় দেখছিলাম, তাই এই দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। এ একটা মস্ত শিক্ষা হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পর পাটন থেকে পাটনের পশ্চিমে সুরুমা গ্রামে আমার অস্থায়ী আবাস স্থাপন করলাম। একদিন সকালে পাটন চলেছি ঘোড়ায় চড়ে। সেখানে কিছু কাজ আছে তাই সেরে আসতে। পথে পাটনের কাছে পশ্চিম উত্তর কোণে পাহাড় জঙ্গলের মাঝে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম জোঁজা জোঁড়। পার হবার সময় চোখে পড়ল একটি ঘিসিয়ারী (ঘাসের উপর দিয়ে ভারি জিনিস টেনে নিয়ে যাবার দাগ) গ্রাম থেকে বনের দিকে চলে গেছে। দেখেই কৌতূহল হল কোন জানোয়ার কি নিয়ে গেল গ্রাম থেকে। হয় বাঘ নয় চিতা হবেই। ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গের লোকজনদের মধ্যে থেকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘিসিয়ারী অনুসরণ করে বনের দিকে চললাম। সঙ্গের অন্যান্য লোকজনদের বললাম গ্রামে গিয়ে সন্ধান নিতে কি ব্যাপার। ঘিসিয়ারী অনুসরণ করে প্রায় এক চতুর্থাংশ মাইল আন্দাজ গিয়ে দেখি অল্প জঙ্গলের মধ্যে একটি মরা বাছুর ঝোপের নিচে পড়ে রয়েছে। কাছেই একটি ঘুটঘুরী। পায়ের চিহ্ন ও গায়ে দাঁতের দাগ দেখে বুঝলাম চিতার কাণ্ড। ওকে সদ্য ওখানে

রেখে চিতা সরে গেছে। ইতিমধ্যে আমার যে লোকরা গ্রামে সন্ধান দিতে গিয়েছিল তারা এসে গেল। তারা গিয়ে দেখে গ্রামের এক গোয়াল ঘর থেকে ঘিসিয়ারীর আরম্ভ। বেশ বড় গোয়াল ঘর। মাটির থেকে সাত আট ফুট উঁচু দেওয়াল, তার উপর হাত খানেক হাত দেড়েক ফাঁক, তার উপর চালা। চিতা লাফিয়ে দেওয়ালের উপর উঠে, দেওয়াল ও চালের এই ফাঁকের ভেতর দিয়ে গোয়ালের ভেতর ঢুকেছে ও একটি বাছুর মেরে সেটিকে মুখে করে লাফিয়ে আবার দেওয়াল পেরিয়ে বেরিয়ে মাটির উপর দিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। সকাল তখন সাতটা। যার গোয়াল সে তখনও জানে না যে চিতা তার বাছুর নিয়ে গেছে। অত গরু বাছুরের মধ্যে তার খোঁজ তখনও পড়ে নি।

স্থির করলাম চিতাটিকে শিকার করব। সঙ্গের লোকজনদের বললাম, তোরা এখানে পাহারা দে, চিল শকুন এবং চিতা এসে না খেতে পারে, আমি কাজ সেরেই আসছি। সোজা পাটন গিয়ে সেখানকার কাজ সেরে সুরুমা ক্যাম্পে ফিরে সেখানকার কাজও শেষ করে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলাম যখন, বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটে। কাছেই পাহাড়ের কোলের কাছে কতগুলি বিরাট বিরাট পাথরের চাঙড় পড়ে, তারই কাছে মড়ি। লোকজন যারা পাহারায় ছিল তারা এমনি একটি ন্যাড়া পাথরের চাঙড়ের উপর আমার বসবার জায়গা করেছে। একটি গাছ পাথরটির গা ঘেঁসে উঠেছে তারই গায়ে, তাজা কেটে আনা কতগুলো ডালপালা সাজিয়ে আমার বসবার জায়গা। ডাল পাতাগুলি এমনভাবে নিচু করে সাজিয়ে বাঁধা যাতে নিচের থেকে চিতা আমায় দেখতে না পায়। আমি তার উপর গিয়ে বসলাম এবং লোকজন সব চলে গেল।

সামনে আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট আন্দাজ দূরে পড়ে মৃত বাছুরটি। আমার চারশ'-পাঁচ রাইফল্‌টি সামনে রেখে মড়ির দিকে নজর রেখে চুপ করে বসে আছি। মিনিট পনর কুড়ি কেটে গেছে।

হঠাৎ আমার পাশে একটা খুব মৃদু শব্দ শুনলাম। মাথা না ঘুরিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখি আমার কাছ থেকে পনর ফুট আন্দাজ দূরে পাঁচ ফুট আন্দাজ উঁচু একটি পাথরের চাঙড়ের উপর হৃষ্টপুষ্ট প্রমাণ মাপের একটি চিতা পেছনের আরেকটি উচ্চতর পাথর থেকে লাফিয়ে নেমে সবে বসছে। আমাদের মাঝে কোনও রকম আবরণ বা অন্তরাল নেই। যে কোনও মুহূর্তে সে আমাকে দেখতে পারে। কিন্তু তার সমস্ত মনোযোগ তখন মড়িটির উপর নিবদ্ধ। সেই সকালে রেখে গেছে, এতক্ষণ লোকজনের সাড়া পেয়ে আসতে পারেনি। ক্ষুধার্ত লোভাতুর দৃষ্টিতে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মড়িটির দিকে। ক্রমে সে সামনের দু-পা মেলে নিচু হয়ে বসল। বেলা আরেকটু পড়ার অপেক্ষায় তার শিকার পাহারা দিচ্ছে। আসন্ন ভোজের আনন্দে মসগুল। পেছনের ল্যাজটিকে আস্তে আস্তে বেঁকাচ্ছে ও সোজা করছে। শ্বাস রুদ্ধ করে বসে আছি কোন রকমে, নড়লেই পড়ে যাবে ওর দৃষ্টি আমার উপর। সে নিচু হয়ে বসতেই আমার সামনের পাতার অন্তরাল এসে গেল তার চোখ ও আমার মাঝে। চট করে বন্দুক তুলে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভেতর লক্ষ্যস্থির করে গুলি করলাম। শব্দ করে তার দেহ উল্টে পড়ল পাথরের উপর থেকে, আমার Soft nosed expanding bullet তার কাঁধের ডান দিক দিয়ে ঢুকে ওপারের বাঁ দিকের সাত ইঞ্চি চামড়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

ষোল

মা

স্মৃতি ও অনুভূতি জীবনের পরপারে মানুষের সহ-গমন করে কিনা জানি না, তবে এ জীবনে তারা এনে দেয় মাধুরিমা ও তীব্র আত্মগ্লানির জ্বালা আমাদের সুকৃতি এবং ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত ভুল-ভ্রান্তি দুষ্কৃতির প্রতিদানে। আমার শিকার-জীবনের দু-একটি এমন ঘটনার কথা মনে পড়ে যার কালো দাগ কালের প্রবাহে এতটুকুও ধুয়ে গেল না মানসপট থেকে আজও। এ কাহিনী তারই একটি।

পালামৌ জেলার লেসলীগঞ্জে তখন আমার ক্যাম্প। ১৯১৭ সাল। ছোটভাই বিনয় এসেছে আমার কাছে গ্রীষ্মের ছুটিতে। ঠিক হল একদিন তাকে নিয়ে শিকারে যাব। শৈশবে তার বন্দুকের শব্দে বড় ভয় ছিল। সে বছর পূজোর সময় বাড়ির সকলে দেশে গেলেন পূজো উপলক্ষে, কেবল রাঁচীর বাড়িতে রইলাম আমি। সামনে ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা বলে কাছে রাখলাম আমার ছোট ভাইটিকে, তাকে শিকার শেখাব এই আশ্বাস দিয়ে। তখন সে ছোট বালক মাত্র। শহর ছাড়িয়ে মোরাবাদীর বিস্তৃত ঘোড়দৌড়ের মাঠের গায়ে আমাদের বাড়ি। একদিন নির্জন মধ্যাহ্নে দেখি মাঠের মাঝে চিল বসে আছে। বন্দুক তৈরি করে নিয়ে ছোট ভাইকে ডাকলাম, "খোকা শিকার করবে এসো।" নিশানা সব ঠিক করে তাকে কি করে কি করতে হবে বলে এবং দেখিয়ে দিলাম। বন্দুকের ঘোড়া টিপতেই চিল উল্‌টে পড়ে গেল এবং সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল সে "মার দিয়া"। সেই যে তার আত্মবিশ্বাস এসে গেল, তারপর মোরাবাদীর আস-পাশের কত ঘুঘু এবং চাহা যে তার বন্দুকের লক্ষ্য হয়ে প্রাণ হারালো তার সংখ্যা নেই। ক্রমে সে বাঘ ভল্লুক চিতা হরিণ সব রকম শিকারই করে এবং কালে খুব নামী শিকারী হয়ে খ্যাতি অর্জন করে। আত্মবিশ্বাস এমনি জিনিস।

১৯১৭ সাল। আমার কাছে যখন এসেছে সে তখন বয়স তার কৈশোরের শেষপ্রান্তে, সবে কলেজে পড়ে। লেসলীগঞ্জ ইনস্‌পেকশান বাংলোর পাশাপাশি দুটি ঘরে থাকি আমি ও আমার সহকর্মি শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমরা কেস ওয়ার্ক করি। আমার একটি স্থানীয় ভুঁইয়া শিকারী ছিল। তাকে পাঠালাম জঙ্গলের কোথায় শিকার আছে সেই সন্ধানে। সে এসে সংবাদ দিল তেত্রায়েন গ্রামের যে বন সেখানে একটা উৎস আছে যেখানে জল খেতে সব জানোয়াররা আসে।

বেশ বেলা থাকতে থাকতে আমরা গেলাম সেখানে শিকারের সন্ধানে। আমরা দুই ভাই এবং নগেন। তিনদিকে পাহাড় ঘেরা, তারই কোলে উৎসটি আর উৎসারিত জল জমে একটি জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে, তারই কিনারায় মাটিতে বসলাম আমরা কিছু দূরে দূরে। বিকেল ক্রমে সন্ধ্যায় পৌঁছল, সন্ধ্যার আলোও মিলিয়ে এল রাতের আঁধারে। কিন্তু আমাদের প্রতীক্ষা সফল করতে কোন জানোয়ারের দেখা মিলল না। ও পাশের পাহাড়ের মাথায় শোনা গেল "অ্যাঁ...ও..."। বাঘ তখন হাইছেড়ে ঘুম থেকে উঠে শিকার অন্বেষণে বেরোচ্ছে, এ তারই স্বর। একবার পায়ের শব্দে প্রস্তুত হয়ে চেয়ে দেখি শেয়াল তার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাইতে চাইতে জল খেতে আসছে; নিরাশ হয়ে বন্দুক নামিয়ে রাখল ওরা, ওপাশে বিনয় ও নগেন। বৈদ্যুতিক টর্চের প্রচলন হয়নি সে যুগে, তাছাড়া সেটা কৃষ্ণ-পক্ষের শেষ দিক, কাজেই অন্ধকারে বসেও কোন ফল হবে না জেনে সেদিন ফিরে এলাম।

পরদিন সংবাদ এল শিকারের। কাছের অন্য আরেকটি জঙ্গলে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সামনে রথের চূড়ার মত একটি পাহাড়, তার পেছনে পশ্চিমদিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে পর্বতশ্রেণী। পেছনে পাহাড়ের কোল বেয়ে সামনের চূড়াকৃতি উঁচু পাহাড়টিকে পরিক্রমা করে আমাদের সামনে দিয়ে বয়ে গেছে

একটি সরু নদী, তার এপারে কতকগুলি শাল ও মহুয়ার গাছ। উঁচু পাহাড়ের ঠিক উলটো দিকে নদীর এপারে একটি মাচা। উত্তর-মুখো হয়ে পাহাড় সামনে করে তাতে বসল বিনয় ও নগেন। তাদের কাছ থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের পশ্চিমদিকের ঢালু যেখানে শেষ হয়েছে তার উলটো দিকে একটি মহুয়া গাছে আশ্রয় নিলাম আমি, এক মাচায় তিনজন বসলে কারুরই শিকারের সুবিধা হবে না বলে। গ্রীষ্মের তপ্ত তৃষ্ণার্ত হাওয়া নদীর সব জল নিয়েছে শুষে, কেবল বাঁকের কাছাকাছি মাচা থেকে কুড়ি গজ ও আমার কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরে নদীর শুকনো বালির মাঝে খানিকটা জায়গায় জমে আছে জল, অন্তঃসলিলা কোন উৎস থেকে চুঁইয়ে এসে, তাই একে বলে চুঁয়া।

বেলা পড়ে এসেছে। দিনশেষের আলোয় এসেছে উদাস গৈরিকের ছোঁয়া। চেয়ে দেখি নদীর ওপারে পাহাড়ের ঢালু পথে নেমে আসছে এক ভল্লুকী ধীর মন্থরগতিতে, তার সঙ্গে দুটি বাচ্চা শিশু সুলভ চাঞ্চল্যে ভরা। কখনও বা একটি দৌড়ে কিছুদূরে এগিয়ে যায় আবার ফিরে যায় মার কাছে। মুখে নাক লাগিয়ে আদর করে। দ্বিতীয় বাচ্চাটি দৌড়ে আসে, প্রথমটিকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করে, ভাবটা "মা কি একা তোমার নাকি, আমারও মা।" আবার দুজনে দৌড়ে এগিয়ে যায়, মার সঙ্গে খেলে লুকোচুরি। মাও মাতৃস্নেহে এদের দুষ্টুমী, চাঞ্চল্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলে। মন বলতে থাকে, "আহা, এদের যেন গুলি না করা হয়, এদের অনাবিল সুখের মাঝে যেন মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ না টেনে দেয়।" ভাই এবং নগেনকে বার বার বলে দিয়েছিলাম তৃষ্ণার্ত জীবকে জল না খেতে দিয়ে গুলি করবে না। মা তার শিশুদের নিয়ে নেমে এল জলের ধারে। খাওয়া শেষ করে সবে ফেরবার দিকে চলতে শুরু করছে, এমন সময় একই সঙ্গে দুই বন্দুকের গুলির শব্দ। ত্রস্ত মা ভল্লুক আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে করতে শিশুরাও ছুটে এল মার কাছে, যে মা তাদের একমাত্র আশ্রয়, সব বিপদ আপদ ভয়ের

সূচনায় যার ক্রোড়ে পায় তারা অভয় ও আশ্বাস। সাধারণত জন্তু জানোয়ার আহত না হলে শব্দ করে না, ভাবলাম আহত হয়ে চলে যাবে, তিলে তিলে মরবে তার চেয়ে শেষ হয়ে যাক। কি জানি কি যে ভাবলাম, কি যে হয়ে গেল, বন্দুক তুলে নিয়ে গুলি করলাম। লুটিয়ে পড়ল ভল্লুকের দেহ, 'মা' 'মা' করে আর্তনাদ করে উঠল বাচ্চারা। আরেকটা গুলি। পড়ে গেল একটি বাচ্চা তার মার কাছেই, যেন মার আশ্রয়ে চির বিশ্রাম নিল। দ্বিতীয় বাচ্চাটি উঁচু পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল, 'মা' 'মা' আর্ত ক্রন্দনে মুখরিত করে সারা বনের স্তব্ধতা। পাহাড়ের মাথায় বন থেকে বনান্তরে ধ্বনিত হতে লাগল সেই মাতৃহারা অবলম্বনহীন ভল্লুক শিশুর করুণ ক্রন্দন শুধু 'মা' 'মা' 'মা'। যেন এক নিরন্তর খোঁজা, অশেষ জিজ্ঞাসা

'কোথায়' ? যার কোন উত্তর নেই। বুকের ভেতর থেকে কান্না ঠেলে এল, একি করলাম! তার সে কান্না আর সহ্য করতে না পেরে তাকে চুপ করাবার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়লাম। একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার শুরু হল সেই কান্না, শব্দ সূচিত করল সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চলেছে যেখানে গুহায় হয়তো তার বাড়ি। আবার গুলি করলাম শব্দ লক্ষ্য করে। ভয় পেয়ে তার কান্নার বাইরের প্রকাশ থেমে গেল, চারিদিক নিস্তব্ধ।

আকাশে আলোর আভাষ তখন মিলিয়ে গিয়ে আঁধারে ছেয়ে গেছে চারিদিক। গাছ থেকে নেমে সরু একটি ডাল ভেঙে তাতে শুকনো পাতা কতগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আগার দিকে আগুন ধরিয়ে মশালের মত ধরে গেলাম যেখানে শুয়ে মা ও তার সন্তান। দেখলাম দুজনের গায়েই একটি একটি গুলির দাগ, আগের গুলি তাদের লাগেনি, আমারই গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে তারা। সঙ্গে বাচ্চা ছিল বলে মায়ের সেই ভয়ার্ত চিৎকার, গুলি লেগেছে বলে নয়।

ভুলে গেলাম যে, শিকার করতে, হত্যা করতেই তো গিয়েছিলাম, ভুলে গেলাম তারা হিংস্র পশু। মন জুড়ে রইল তীব্র বেদনা ও বিশ্বমাতারই রূপের বিকাশ, সে মা এবং যে রইল সে মাতৃহারা শিশু।

সতের

সাথী

শুনেছি ক্রৌঞ্চ যুগলের মাঝখানে ব্যাধের নির্মম শর যখন টেনে দিল বিচ্ছেদের রেখা তখন শোকার্ত ক্রৌঞ্চের করুণ দৃশ্য স্পর্শ করে আদি কবির অন্তর, তাঁর স্পন্দিত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় পৃথিবীর আদি কাব্য নির্ঝরের ধারা।

১৯১৬ সালে আমি যখন জপ্লাতে অ্যাটেস্টেশানের কাজ করি তখন একদিন কুমীর শিকারে যাই। বিশাল আয়তন শোন নদের বক্ষে কোথাও কোথাও জেগে উঠেছে পীতাভ বালির চর, তাতে চখাচখির জেলা দূর থেকে দেখা যায়। এই পাখীরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। শোনা যায়, একবার জোড় ভাঙলে তার সাথী চিরদিন থাকে নিঃসঙ্গ, পুরাতনের আসন শূন্য থাকে, তবু নবাগতের স্থান হয় না সেখানে। ওখানকার লোকেদের বিশ্বাস সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে এলে দুই সাথী নদীর দুই পারে আশ্রয় নেয়, রাত্রিশেষে উষার আলোয় আবার হয় তাদের মিলন। এ ওখানকার অধিবাসীদের স্থির বিশ্বাস, এর অন্যথা বললেও তারা উড়িয়ে দেয়। যাই হোক, সেদিন বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে একটিকে মারতেই সেটি পড়ে গেল, বন্দুকের শব্দে অন্যান্য পাখী যারা বসেছিল উড়ে গেল। একটি পাখী কিছুদূর উড়ে গিয়ে যখন দেখল তার সাথী তার সঙ্গে গেল না, তখন ফিরে এল। কিছুক্ষণ তাকে ডেকে ডেকে তার রক্তাক্ত দেহের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াল, শেষটায় ফিরে এসে বসল তার মৃত সঙ্গিনীর কাছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যেন বিশ্বকবির মধুশ্রীর মত বলতে চায় "বিচ্ছেদ ঘটিও না, একই লোকে হোক আমাদের গতি।" সেই থেকে বহুদিন আর পাখী শিকার করিনি। ক্রমে মনে এই প্রশ্ন জেগেছে পশু-পাখীদের মধ্যেও কি আছে সম্প্রীতি, একে অন্যের প্রতি মমত্ববোধ? সন্তানের প্রতি কি পশু কি পাখী সকল মায়েরই দেখছি অসীম স্নেহ, যতদিন সে শিশু

থাকে, কিন্তু সঙ্গীর প্রতি ? এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম একদিন। সে চিত্র জ্বলন্ত রেখায় আঁকা রয়ে গেছে মানস-পটে।

১৯২০ সালের জানুয়ারীর আরম্ভ। সবে গভর্নরের শিকার শেষ হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিল্‌বী এসে বললেন যে, বাঙলাদেশ থেকে তাঁদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু সস্ত্রীক শিকারে আসতে চান, তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে। মিসেস কিল্‌বীর একান্ত ইচ্ছা এমন জায়গায় তাঁদের ক্যাম্প করতে হবে যেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। সারা পালামৌ জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য মানসপটে একে একে ছায়া ফেলে গেল। তারমধ্যে শিকার এবং ক্যাম্প করার উপযোগী দুটি জায়গার কথা বিশেষ করে মনে হয়। এক সারুওতপাট, দ্বিতীয় সেরেন্দাগ। চারহাজার ফুট পাহাড়ের শিখরে সারুওতপাট। অতি অপূর্ব স্থান সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়ই দুর্গম। গাড়ি সেখানে যায় না, হেঁটে এই খাড়াই উঠতে হয়, তাই সে জায়গাটি নির্বাচন-সূচী থেকে বাদ দিলাম। সেরেন্দাগ কেমন হবে দেখবার জন্য মিসেস্ কিল্‌বীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডালটনগঞ্জ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে লাত পার হয়ে কিছু দূর গিয়ে গভীর বনের ভেতর পথরেখা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। পথ হারিয়ে ফেললাম। কোন্‌দিক দিয়ে যাব ভাবছি, এমন সময় শুনতে পেলাম মোষের গলার কাঠের ঘণ্টার শব্দ। মোষ যখন চরছে সঙ্গে চরওয়াহা আছেই—অনুমান করে চিৎকার করে ডাকলাম। প্রত্যুত্তর দিয়ে কিছু পরে কাছে এসে দাঁড়ালে রাখাল ছেলে, যাকে ওরা বলে চরওয়াহা। সেরেন্দাগের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, খুব কাছেই আমাদের গন্তব্য স্থান, জঙ্গলটা পেরোলেই গ্রাম, তার উপকণ্ঠে। বললাম "তুই আমাদের মটরে চল আমাদের পথ দেখিয়ে দিবি", তাতে তার মহা আপত্তি। "না হুজুর, বাঘে আমার মোষ মেরে দেবে, আমি এখান থেকে সরলেই।" "সে কি রে, এখন সকাল ন'টা, গ্রামের এত কাছে, এক্ষুনি ফিরে আসবি, এর মধ্যে বাঘে মোষ মারবে—এও কি একটা কথা হল ? চল

চল।" কি আর করে, শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে নিয়ে চলল। সেখান থেকে মাত্র দু'শ' গজ দূরে জঙ্গল শেষ হয়েছে, একটু আগেই সেরেন্দাগ গ্রাম। আমাদের গম্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে সে তখনই ফিরে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে রাজপথ। বারেসাঁড়ের দিকে রাস্তার পশ্চিম ধারে ওপারেই এক খুব নিচু পাহাড়, যেন কোন মহাকায় দৈত্যের পাশবালিশের মত দেখতে। গাড়ি রেখে আমরা তার ওপর উঠে গেলাম। চেয়ে দেখি সামনে অপরূপ শোভা। বহুদূর ব্যাপী ঢালু বেয়ে নেমে গেছে অরণ্যের ঢেউ, দূরে উত্তর বাহিনী কোয়েলের রূপালী রেখা, তার ওপারে শান্ত সমাহিত পাহাড়, অঙ্গে তার বনের আবরণ, সকালের আলোয় প্রদীপ্ত। তার চারহাজার ফুট উঁচু চূড়া সুরগুজারাজ সীমানায় ঢালু পালামৌর অধিকারে। মিসেস কিল্‌বী মহাখুশি। সেই নিচু পাহাড়টির উপরেই হবে ক্যাম্প। কোথায় কোন্ তাঁবু হবে সব কথা হয়ে গেল। সেরেন্দাগ থেকে ফেরবার পথে দেখি সেই রাখাল ছেলেটি বসে কাঁদছে, যেটুকু সময় সে অনুপস্থিত ছিল তার মধ্যেই বাঘ এসে তার দুটো মোষ মেরে দিয়ে গেছে। আমরা তাকে সেই মোষ দুটির মূল্যস্বরূপ টাকা দিলাম কিন্তু তাতে তার দুঃখ কিছু মাত্র প্রশমিত হল না। সে বার বার বলতে লাগল "টাকা দিয়ে আমি কি করব, ওদের যে ছেলেবেলা থেকে হাতে করে বড় করেছি, ঘরের লছমী ছিল ওরা।"

২২শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় মিঃ কিল্‌বীর সম্মানিত অতিথিরা এলেন, লেডী ও স্যার হেনরী হুইলার, বাংলার তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলেন স্যার হেনরী। শিকারের বন্দোবস্ত হিসাবে কদিন থেকে আমরা বাঘের সম্ভাবিত গতিপথে মোষ বাঁধবার ব্যবস্থা করেছি। ২৩শে সকালে সংবাদ এল কাছেই কোয়েলের ঠিক পশ্চিম পারেই জঙ্গলে বাঘে মোষ মেরেছে। মাচা ইত্যাদি আগেই প্রস্তুত ছিল। সকালেই সেই বনে চলে গেলাম আমরা শিকারের জন্য প্রস্তুত হয়ে।

মাচাগুলির সামনে দিয়ে ডান দিক থেকে বাঁয়ে ঘুরে গেছে একটি ছোট নালা। একেবারে ডানদিকের মাচায় আমি, আমার পাশের মাচায় মিসেস্ কিল্বী একা, তার পাশেরটিতে লেডী ও স্যার হেনরী হুইলার এবং সবচেয়ে বাঁয়ে মিঃ কিল্বী। আমার ও মিঃ কিল্বীর দু'পাশ থেকে ক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে গাছের উপর স্টপরা। আমাদের উল্টোদিকে কোয়েলের পার থেকে হাঁকোয়ারা অর্ধচন্দ্রাকারে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো হাঁকোয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। খুব ঘন শালের বন দৃষ্টিপথ রোধ করে। যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা সেখানে উলুঘাস ও বন্য খেজুরে ছেয়ে আছে। বন্য খেজুরের গাছ লম্বা হয় না, বড় বড় ঝোপের মত হয়। হাঁকোয়া আরম্ভে হাঁকোয়ারা খুব জোর একবার করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কিছু পরে হঠাৎ পাশের মাচা থেকে মিসেস্ কিল্বী তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে মিঃ কিল্বীর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন "এখানে এসো, আমি তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি কোথায় বাঘ আছে" (Come here, I can show you where the tiger is) এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘাঁউ করে এক গর্জন করে বাঘ স্যার হেনরী ও মিসেস কিল্বীর মাচার মাঝখান দিয়ে পেছনে পালিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। অদূরে একটা খস্ খস্ শব্দ লক্ষ্য করে সজাগ হয়ে রইলাম, খেজুর ঝোপের তলা থেকে বেরিয়ে এল বিরাট এক ভল্লুক। যদিও বাঘের শিকার, অন্য জানোয়ার মারা নিয়ম নয়, তবুও বাঘ তো পালিয়ে গেছে এই মনে করে বন্দুক তুলে মেরে দিলাম তাকে, সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠল সারা বনের স্তব্ধতা। কিন্তু এ-তো শুধু যে আহত তার আর্তনাদ নয়, কি ব্যাপার? চেয়ে দেখি বিকট আর্তনাদ করতে করতে পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল আরেকটি ভল্লুক, আয়তনে আহতটির চেয়েও বড়—তারই সাথী। কাছে এসে দেখল ওর গা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, কিছুক্ষণ ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, তারপর যখন দেখল ওর চলার ক্ষমতা নেই তখন

সামনের দু পা দিয়ে তার বিশাল দেহ কোলে তুলে নিল। আসন্ন বিপদ, মৃত্যু কোন কিছুই তাকে টলাল না, একা স্বচ্ছন্দে পালাতে পারত, তাও সে গেল না। সাথীকে বুকে তুলে নিয়ে বিপদ উপেক্ষা করে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। হাঁকোয়াদের সামনে পড়তেই তারা ওদের প্রাণপণে আটকাবার চেষ্টা করল কিন্তু দুজনের গর্জন শুনে ও তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্ভীক গতি দেখে প্রাণভয়ে সরে দাঁড়াল। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু। স্বকৃত অপরাধের কথা ভেবে এত দুঃখ হল, মনেপ্রাণে কামনা করতে লাগলাম বিপদের মুখ থেকে তার সঙ্গীকে যেমন করে উদ্ধার করে

নিয়ে গেল, মৃত্যুর গ্রাস থেকেও যেন তাকে সযত্নে ঢেকে রাখতে পারে। চাই না আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি, গুলি যেন তাদের বিচ্ছেদ না ঘটায়।

* * *

কিন্তু সেদিন অন্য একটি দুর্ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষমান ছিল। হাঁকোয়া চলছে। হঠাৎ একদিকে হাঁকোয়াদের মধ্যে খুব গোলমাল শুরু হল। একটুক্ষণ থামে আবার শুরু হয়, আবার থামে আবার শুরু—এমনি করে চলল। কি ব্যাপার ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপরই কানে এল বাঘের গর্জন সেই দিক থেকে। দেখি, হাঁকোয়ারা চুপচাপ ডান দিক দিয়ে ফিরে চলেছে। ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হল রে? হাঁকোয়া শেষ কর"। তাতেও তারা চলে যাচ্ছে দেখে যাঁরা মাচায় আছেন তাঁদের বসে থাকতে বলে আমি নেমে গেলাম দেখতে কি ব্যাপার। যেদিকে গোলমাল হচ্ছিল সেদিকে গয়ে হাঁকোয়া যাদের দেখলাম তাদের জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলল, বাঘ একজনকে মেরে ফেলেছে। প্রথম যে মিসেস্ কিল্‌বীর মাচার পাশ দিয়ে পালায় তারই জোড়া এটা। এগিয়ে গিয়ে দেখি মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটি, বাঁ হাতটা মেলা রয়েছে। বাঘের মস্ত থাবার এক আঘাতে মাথার চামড়া ছিঁড়ে খুলির হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বাঁ বাহুর উপর আরেক থাবার চিহ্ন, সেখানেও গভীর ক্ষত, হাড় দেখা যাচ্ছে। পরনে খাটো ধুতি ও জামা। দূর দূর গ্রাম থেকে এরা হাঁকোয়া করতে আসে। অনেক সময়ই রাত্রে আর গ্রামে ফিরে যেতে পারে না, তাই সামান্য কম্বল যার যা থাকে পালামৌর দুর্দান্ত শীতের রাত্রে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিয়ে আসে। সেটা সঙ্গেই থাকে কাঁধের উপর বা পিঠে বাঁধা। এরও একটি কম্বল পুরু করে ভাঁজ করা কাঁধের উপর ছিল, সেটা অদূরে পড়ে রয়েছে। হাঁকোয়ারা এগোতে এগোতে সামনে দেখে বাঘ। সকলে মিলে হল্লা করাতে সে একটু এগোয় এবং কিছু দূর গিয়ে বসে। আবার আরও সকলে জড়ো হয়ে

দ্বিগুণ চিৎকার করে, আবার এগোয় সে, এইভাবে চার-পাঁচবার এগিয়ে সে মরিয়া হয়ে ফিরে দাঁড়ায়। মিসেস্ কিল্বীর শিকারের রীতি-বিরুদ্ধ চিৎকারে বোঝে সামনে লোক আছে, তাতে তার সন্দেহ জাগরূক হয়। প্রথম বাঘের গর্জনে বুঝেছিল যেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেদিকে বিপদ আছে। মিসেস্ কিল্বীর চিৎকারের অন্য ফল হল এই ভল্লুক তার নিজের পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে বনের অন্তরাল দিয়ে লুকিয়ে যেতে গিয়ে আমার সামনে পড়ল। তারপর গুলির শব্দ ও ভল্লুকের আর্তনাদে সন্দেহ আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হল। তাই তখুনি সে মরিয়া হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। ভল্লুককে গুলি করা শিকারের রীতিবিরুদ্ধ না হলেও আমার ঠিক উচিত হয়নি, কিন্তু আরেকটা বাঘ যে থাকতে পারে এটা অনুমান করিনি।

কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম লোকটি মরেনি। বাঘ তার কাঁধের কম্বল কামড়ে ধরে লোকটিকে ধরেছে মনে করে মনের সাধে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে পালিয়ে যায়। কম্বলটি দেখলাম। যেখানে কামড়েছে সেখানে চাপ বেঁধে গেছে। যেন হাইড্রলিক প্রেসারে চাপা।

মাচায় যাঁরা আছেন তাঁদের ডেকে বলে দিলাম শিকার হবে না, বাঘ মানুষ জখম করেছে। ডালটনগঞ্জ থেকে যাবার সময় তদানীন্তন সিভিল সার্জন রায় বাহাদুর শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সহ একটি বাক্স এনেছিলাম। সঙ্গে সেটি ছিল। তা থেকে টিংচার আওডিন দিয়ে, ক্ষত পরিষ্কার করে কার্বলিক দিয়ে পুড়িয়ে তখনই জঙ্গল থেকে পাৎলা গাছ কাটিয়ে তার সাহায্যে মই-এর মত স্ট্রেচার বানান হল এবং তাতে শুইয়ে লোকটিকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। আমার নিজের গাড়ি ছিল না। মিঃ কিল্বীর মোটর চাইতে তিনি বললেন "একটু পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—all that he requires is washing with clean water." যাই হোক, তা যে নয় তা তাঁকে বলে লোকটিকে

যোলজন বাহক দিয়ে সেই অবস্থায় পত্রপাঠ ডালটনগঞ্জ হাসপাতাল অভিমুখে রওনা করে দিলাম। ব্যবস্থা করলাম যাতে কিছু দূর অন্তর অন্তর বাহক পরিবর্তন হয়। ওখানে এ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন ছিলেন শ্রীবিমল রায়। তাঁর কাছে চিঠি দিলাম যাতে চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় এবং যে-কোন মতে হোক ওর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। ভাগ্যক্রমে লোকটি সব চেষ্টা সার্থক করে মাসখানেক পরে সেরে উঠল।

শিকারের অন্য খবর থাকা সত্ত্বেও সেদিন আর শিকার হল না। এই ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় হাঁকোয়াদের ভেতর একটা বিষাদের ছায়া পড়েছিল। তারা আর সে উদ্যম নিয়ে হাঁকোয়া করতে পারবে না জেনে আমিও সে চেষ্টা থেকে বিরত হলাম। সেদিন অতিথিরা স্থান পরিদর্শন করে কাটালেন।